মেঘের আড়ালে চাঁদ: সত্যকে দেখার অব্যর্থ উপায়

এস. এম. জাকির হুসাইন

সত্যকে দেখার উপায়

এস.এম. জাকির হুসাইন

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০

প্রকাশনায়ঃ
শাহীদ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন:৭১১৮৪৪৩
E-mail : gyankoshprokashoni@gmail.com
gk_tarafder@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০১১

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

বর্নসজ্জা
রিয়াজুল ইসলাম (রিয়াজ)
এস. এস. পাবলিসার্স
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণেঃ
নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
১৫/বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯৬৬৭৯১৯

মূল্য : ১৭০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8933-62-6

সতর্কতা

এই বইটির কিছু কিছু শব্দ পাঠকের অন্তরকে আঘাত করবে, ফলে তা নিরর্থক কষ্ট পাবার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হয়ে যাবে, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সম্পর্কে তার ভুল ধারণাকে হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং আসুন আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বইটি পড়ার চেয়ে বরং নিজেকে বদলে দেয়ার জন্য তা পড়ি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

এ. এফ. হীরা

এই বইটির জন্য গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করতে এবং লিখতে যে ব্যয় হয়েছে তিনি তা বহন করেছেন। ফলে এই বই যদি কারো সামান্য পরিমাণও কাজে লাগে তাহলে উপরোক্ত ব্যক্তি সেই কৃতিত্বের অংশীদার।

সহায়ক অনুবাদঃ

হাবিবুর রহমান অনূদিত
কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ

পরবর্তী বই:

১. তাকওয়ার শক্তি
২. কোরআনের আলোকে বৌদ্ধধর্মের শূন্যতাবাদ
৩. অন্তরের তীর্থযাত্রা
৪. আধ্যাত্মিক বুদ্ধির বিকাশ
৫. ঈমানের স্তরভেদ
৬. মনের কাঠামো
৭. নামাজের মারেফত ও স্বচ্ছ নামাজ
৮. সূরা ফাতিহার মারেফত
৯. স্ত্রীর মন
১০. রূপকের অন্তরালে
১১. প্রশ্নের দর্শন
১২. আইনের দর্শন
১৩. একটি ইসলামিক বিপ্লবের রূপরেখা
১৪. গীতা ও কোরআন: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা
১৫. আইনস্টাইনের তত্ত্ব এবং কোরআনের ভাষ্য
১৬. আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নয়, আত্ম-উপলব্ধি
১৭. জীবন-বীমা, সঞ্চয়, এবং নিরাপত্তা
১৮. আলোর ছায়ায় শীতল ঘুম
১৯. জীবনের দর্শন
২০. আনন্দের আলোকচিত্র
২১. বিচ্ছেদ এবং বিরহের কিচ্ছা
২২. বিশুদ্ধ চিন্তা
২৩. আল্লাহর নামের দর্শন
২৪. মন ফিরে এল ঘরে
২৫. অদৃশ্যের জ্ঞান

মেঘের আড়ালে চাঁদ

ভূমিকা

আকাশে চাঁদ উঠেছে। তা লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এক খণ্ড মেঘ চাঁদের ওপর এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, যে আমরা চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে মেঘের বিভিন্ন কিনারে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়েছে, যা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে চাঁদের অস্তিত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তবে এই সন্দেহমুক্ত অবস্থাকে আমাদেরকে খুব বেশি তৃপ্তি দিতে পারছে না, কারণ আমরা চাচ্ছি সরাসরি চাঁদের মুখোমুখী হতে, এবং তার অম্লান মুখখানি দেখতে। তাহলে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। মেঘ খণ্ড চাঁদের মুখে ঘোমটা হয়ে আর থাকবে না, দূর হয়ে যাবে।

আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে সত্যের চাঁদ জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু তার সামনে কিছু মেঘ আমাদের অন্তরকে সেই সত্যের রূপ দেখা থেকে বিরত রাখছে। আমরা যদি এই মেঘ কেটে যাওয়ার জন্য শত শত বছর ধ'রে অপেক্ষা করি তবুও হয়তো সফল হব না, যদি এই মেঘকে আমরা না চিনি। মানুষের জন্য সেই বিষয়টি আর ক্ষতিকর

হয়ে দাঁড়ায় না, যার রহস্য সে জানতে পারে। মেঘ সত্য এবং অন্তরের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সেই মেঘ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা না যায়। কিন্তু মেঘের রহস্য জানা হয়ে গেলে মেঘের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে সত্যের প্রসঙ্গে মেঘ ব'লে আমরা যা বোঝাচ্ছি তা মূলত বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কোনো পরিস্থিতি নয়, বরং আমরা সত্যকে দেখার উপযুক্ত নই ব'লেই আমাদের দৃষ্টির দরিদ্র্যই, এই মেঘ সৃষ্টি করে। ফলে আমরা যখনই সত্যকে দেখতে চাইব, তখনই আমাদের অন্তরের সামনে এই মেঘ এসে হাজির হবে, এবং এ থেকে রেহাই না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অন্তর কখনোই সত্যকে দেখবে না। তাহলে আসুন আমরা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করার মাধ্যমে সত্যের উজ্জ্বল চাঁদকে দেখার চেষ্টা করি।

(সত্য কাকে বলে?)

আমরা আমাদের এই মৌলিক প্রশ্নটি দ্বারা আমাদের যাত্রা শুরু করতে চাই। এই যাত্রা শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নয়। দার্শনিক অর্থেও। ফলে এ যে শুধু আমার মনকে উজ্জীবিত করবে তা নয়, আমার চিন্তাকেও প্রশান্ত করবে। সত্য কী? এই বিষয়ে পৃথিবীতে কখনোই প্রশ্ন এবং অনুসন্ধানের অভাব ছিল না। এবং এই প্রশ্নের জবাবে মানুষ যা পেয়েছে তার অধিকাংশই মিথ্যা থেকে সংরক্ষিত। তবে তার অধিকাংশই আংশিক সত্য, সর্ব সত্য নয়। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারি। ধরা যাক আমি আপনাকে বললাম যে আমি ভূত দেখতে পাচ্ছি। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন - কই, কোথায়? আমি আপনাকে একটি অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বোঝাতে চাইলাম যে ঐ অন্ধকারের মধ্যে ভূত রয়েছে। আপনি অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে পড়লেন। কোনো ভূত দেখলেন না। তখন আপনি বললেন - তুমি মিথ্যা বলছ। আমি যেহেতু যুক্তিতর্ক বেশি পছন্দ করি, সেহেতু আমি চাইলাম যে আপনাকে একটু বোকা বানিয়ে দিব। কারণ আমি যাকে সত্য বলেছি, আপনি তাকে মিথ্যা বলেছেন। তখন আমি আপনার কাছে জানতে চাইলাম কোন কারণে আমার কথা আপনার

কাছে মিথ্যা মনে হয়েছে। আর তা যে মিথ্যা তার প্রমাণ কী? তখন আপনি বললেন, আমি তো কোনো ভূত দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনি মিথ্যা বলেছেন। তখন আমি হয়তো আপনাকে এই যুক্তিটি দেখালাম: আপনি দেখতে পাননি ব'লেই আমার কথাকে মিথ্যে সাব্যস্ত করছেন? তাহলে কি আপনি সত্যকে আপনার দেখা না-দেখার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল ক'রে ফেললেন না? ধরা যাক আমি ভূত দেখিনি। কিন্তু আমার দেখা না দেখা আপনার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। আপনার কাছে বড় হয়ে উঠেছে আমার দেখা না দেখা সম্পর্কে আপনি নিজের দেখাকে অবলম্বন ক'রে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা। সুতরাং আমার দেখা না দেখা এখানে বড় কথা নয়। এখানে বড় কথা উঠেছে আপনার নিজের না-দেখা। তাহলে কি আপনার দৃষ্টিশক্তির ওপর আপনার বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল না?

আপনি যেহেতু চিন্তাশীল মানুষ, সেহেতু একটু চিন্তাভাবনা ক'রে বললেন: আসলে তো বিষয়টা তাই! ওখানে আপনি ভূত দেখেছেন কি না, সে তো আসল কথা নয়। আমি যে আপনার কথা অস্বীকার করেছি, এই অস্বীকৃতির পেছনে কোনো মজবুত ভিত নেই। আমার অস্বীকৃতি যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম যে, সত্য কী? - হলো মূল প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্নটির জবাব হিসেবে আমরা যখন মনের মধ্যে কোনো তথ্য অনুসন্ধান করি, তখন কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের যোগ্যতার ওপরেই সেই তথ্যের সত্যতা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এবং এক পর্যায়ে সত্যের দিকে আমরা আর নজর দেই না, বরং তা নিয়ে আমরা কী ভাবছি সেই দিকেই নজর বেশি দেই। এছাড়া সত্যকে জানার অন্য কোনো উপায় মানুষের নেই। এ কারণে কোনো কিছু সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে জানার সঠিক উপায় সম্পর্কে জানাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আবারও বিষয়টিকে একটু খোলাসা করা যাক। আমি বললাম - অন্ধকারে ভূত দেখা যাচ্ছে। আপনি বললেন -ওখানে কোনো ভূত নেই। সুতরাং আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনি আমার কথা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আপনি যদি বলতেন - আমি তো ওখানে কোনো ভূত দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আপনার কথাটা আমার কাছে সত্য হতে পারত, এবং আমার কোনো অভিযোগ হয়তো থাকত না। কিন্তু আপনি বলেছেন যে, ওখানে না কি আমি কোনো ভূত দেখতে পাচ্ছি না, আপনি আমার দেখার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা। কিসের ভিত্তিতে আপনার যুক্তি দেখিয়েছেন? আপনার নিজের না-দেখতে পারার যুক্তিতে। তাই আমি এখন বলতে পারি - আপনার দৃষ্টির অক্ষমতার কারণে আপনি আমার সত্যকে মিথ্যা বলছেন। কোন বিবেক আপনাকে এ অধিকার দিল? তখন আপনি বুদ্ধিমান হলে বুঝতে পারতেন যে আসলে বিষয়টি ওখানেই এসে ঠেকেছে এবং এই রহস্যটি না জানা পর্যন্ত আমরা সত্যকে কখনও জানতে পারব না।

এখন আর একটি কাল্পনিক উদাহরণ নেয়া যাক। ধরুন আপনি অন্ধকারের মধ্যে ভূত দেখলেন। আপনি কাউকে বলতেও গেলেন না, বা কারো কাছ থেকে শুনতেও গেলেন না। নিজেই দেখেছেন। এখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করছেন - আমি সত্যিই ভূত দেখেছি? এই প্রশ্ন কেন আসছে? আসলে এর আগে থেকেই আপনার মনে একটি বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে যে, আসলে ভূত ব'লে কিছু নেই। কিন্তু কোনো না কোনো কারণে, চোখের ভুলের কারণে, বা মানসিক ক্লান্তির কারণে, আপনি কিছু একটা দেখে ফেলেছেন। তখন এই দেখার অনুভূতি এবং পূর্ববর্তী বিশ্বাস এই দু'য়ের মধ্যে একটি সংঘাত সৃষ্টি হবে, এবং ঐ পূর্ববর্তী বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনি হয়তো বলতে চাইবেন যে, আসলে ভূত ব'লে কিছু নেই। আবার নিজের বুদ্ধির প্রত্যক্ষতা থেকে আপনি যে

অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় আপনার নিজের জানা নেই। ফলে এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত লাগবে এবং যে জয়ী হবে সিদ্ধান্ত সে দিকেই যাবে।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো - আপনি যে ভূত দেখেছেন, সে কথা স্বীকার করতে হবে, কি অস্বীকার করতে হবে তা নিয়ে আপনি নিজেই চিন্তিত! আমরা বাইরে থেকে আপনাকে আর কিভাবে বিবেচনা করব? কেন আপনি নিজেই তা নিয়ে ভাবিত হলেন? কারণ একদিকে নিজের দৃষ্টিকে অস্বীকার করা যায় না, অন্য দিকে নিজের চিরাচরিত বিশ্বাসকেও ঠেলে ফেলে দেয়া যায় না। বিশ্বাসও এক ধরনের দৃষ্টি। এই দুই ধরনের দৃষ্টি আমাদেরকে দুই ধরনের তথ্য প্রদান করছে। এবং ঐ মুহূর্তে যে দৃষ্টির আবেদন অন্তরের কাছে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে, সেই অনুসারেই আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

তাহলে দেখা গেল যে, বাস্তবে আমি ভূত দেখলেও যা, না দেখলেও তাই। সেই দেখা বা না দেখার যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করছি, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আমি কোনো কিছু সত্য না কি মিথ্যা তা নির্ণয় করছি।

অর্থাৎ সত্য মিথ্যার নির্ণয় এবং নির্ধারণ অভিজ্ঞতা-নির্ভর, নিছক যুক্তি-নির্ভর নয়। ফলে শুধু যুক্তির মার-প্যাচ দিয়ে সত্যকে ধরা সম্ভব নয়। তাই তো বার্ট্রান্ডি রাসেলের মতো জাঁদরেল দার্শনিককেও যুক্তির প্রান্তে পৌঁছে যাবার পরও পথ হারিয়ে ফেলতে দেখা যায়।

এ কারণে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আবেগ, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতাবোধ ইত্যাদি মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাদের সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব

এবং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যখন সত্যকে বিবেচনা করব, আমরা আশা করতে পারি যে তখন সত্য তার পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের অন্তরের কাছে ধরা দেবে। তাহলে চলুন, আমরা এগিয়ে যাই।

আর একটি কল্পনার আশ্রয় নেয়া যাক। ধরা যাক আপনার চোখে দেখার মতো কোনো দৃষ্টি নেই। শোনার মতো কোনো কান নেই। এবং স্পর্শের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করার মতো কোনো জাগ্রত অবস্থাও নেই। অর্থাৎ আপনি গভীর ঘুমে মগ্ন। এই সময় কি আপনি সত্যকে খুঁজবেন? কেউ কি গভীর ঘুমের মধ্যে সত্যকে খোঁজে? আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন সেই ঘুম গভীর হয় না। কিন্তু স্বপ্নহীন গভীর ঘুমের মধ্যে আমরা নিজেদেরকেই ভুলে যাই। তার মানে কি এই যে, ঐ মুহূর্তে আমার অন্ত রে বা আমাকে ঘিরে যা আছে, তা সত্য নয়, মিথ্যা? আমার অস্তিত্বই তো সত্য। তা নিয়ে আমি ভাবছি না। ভাবছি যে আমি কখনও কখনও কোনো কিছুকে মিথ্যা বলতে পারি, বা কোনো কিছুকে সত্য বলতে পারি। এই অর্থে সত্য মিথ্যার নির্ণয় এক ধরনের সিদ্ধান্ত এবং উপসংহার। কিন্তু আমি যদি দেখি যে আমার মনই কাজ করছে না - আমার কল্পনা, চিন্তা, ধারণা কোনো কিছুই কাজ করছে না, বরং আমার মন স্বাধীনভাবে শীতল, ঠাণ্ডা ঢেউহীন অবস্থায় বিরাজ করছে, তখন কি আমি কোনো কিছু সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে ভাববো? আসলে তখন আমরা কখনোই তা নিয়ে ভাববো না। কারণ মনের ঐ অবস্থায় মন কখনও মিথ্যাকে বা মিথ্যার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই কোনো কিছু সত্য কি না তা নিয়েও তার ভাবার প্রয়োজন হয় না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা ব'লে আমরা যা বুঝি, তা আসলে আমাদেরই নির্ণয় বা নির্ধারণ মাত্র। সেই নির্ধারণ যদি সঠিক হয়, তাহলে যাকে আমি সত্য বলছি তা সত্য; সেই

নির্ধারণ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে যাকে আমি সত্য বলছি তা হয়তো মিথ্যা, এবং যাকে মিথ্যা বলছি তা মিথ্যা নাও হতে পারে। আমাদের প্রশ্ন হলো - অন্তরের এই নির্ধারণের ওপর নির্ভরশীল না থেকেও কি সত্যকে জানা যায়? যদি জানা যায়, তাহলে তা কিভাবে?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। আমরা সচরাচর মনে করি যে সত্য রয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে, কিংবা কোনো ধর্মের ছায়াতলে না আসা পর্যন্ত অন্তরে কোনো সত্য বিরাজ করে না। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ যা বলেছেন তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, কথাটি একেবারেই ঠিক নয়। বরং কোরআনকে গ্রহণ করার আগে, ইসলামকে গ্রহণ করার আগে, বা যে কোনো সত্য ধর্মকে গ্রহণ করার আগেই, যদি কেউ সত্যকে দেখে, কেবল সে-ই ঐ ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সত্যকে দেখতে পাবে, অন্য কেউ নয়। এখন আবারও প্রশ্ন উঠতে পারে ধর্মগ্রন্থের ছায়াতলে না এসে সত্যকে কিভাবে দেখা সম্ভব? আসলে আমরা যখন কোনো না কোনো ধর্মের বিশ্বাসের ছায়াতলে চ'লে যাই, তখন ঐ ধর্মের বিশ্বাস আমার মধ্যে যতখানি যোগ্যতা সৃষ্টি করছে তার মধ্য দিয়ে আমি তাকাই। সেই যোগ্যতা আমার দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়, এবং ঐ দৃষ্টি অনুযায়ী আমি সবকিছুকে দেখি। সেই দৃষ্টি ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ সত্যের সঙ্গে সবার অন্তরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা যোগাযোগ সমান মাত্রার হয় না। কোনো ধর্মের ছায়াতলে না গিয়ে, কোনো আচরণবিধিকে সত্য হিসেবে না ধ'রে নিয়েও, কোনো বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি অবলম্বন না ক'রেও, সত্যকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এবং সবচেয়ে ভালো কাজ হলো এইভাবে সত্যকে চিহ্নিত করার পর অন্তরে যে শক্তি উদিত হয়, সেই শক্তির আলোকে বাহ্যিক প্রয়োজনে কোন ধর্মটি গ্রহণ করতে হবে তা অনুসন্ধান করা। আমরা একটি বিশেষ আয়াত নিয়ে ভাবতে পারি। ২২নং সূরার ৫৪ নং আয়াত আল্লাহ্ বলছেন:

> এবং এ কারণে যে যাদেরকে *জ্ঞান* দান করা হয়েছে তারা যেন *জানতে* পারে যে এটা আপনার রবের তরফ থেকে সত্য। তারপর তারা যেন এতে *ঈমান* আনে; তারা যেন এর প্রতি আরও *আকৃষ্ট হয়*। নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

একটি বিশেষভাবে লক্ষ করুন: আল্লাহ্ বলছেন যাদেরকে *জ্ঞান* দান করা হয়েছে ...। ধ'রে নিলাম কোনো ব্যক্তি জনাব ক। তাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানে তার অন্তরের এক অংশ পূর্ণ হয়ে গেছে। এবং তারপর আল্লাহ্ বলছেন: তারা যেন *জানতে* পারে যে এটা আপনার রবের তরফ থেকে সত্য। আগেই জ্ঞান দান করা হয়েছে। তারপর আবার নতুন ক'রে তাদের মধ্যে একটি জ্ঞান আসছে। সেই জ্ঞান অনুযায়ী তারা *জানতে পারছে* যে, তাদের রবের তরফ থেকে এটা সত্য। এভাবে সত্যকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এখনও কিন্তু ইমান আসেনি। তাই বলা হচ্ছে - তারপর তারা যেন এতে *ঈমান* আনে। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতা হলো ইমানের শুরু। কিন্তু সচরাচর আমাদের অনেকের ইমান আন্দাজ এবং কুসংস্কার-নির্ভর। যে কারণে আমরা ইসলামের মতো এত নির্ভেজাল এবং সত্য ধর্মের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে কুসংস্কার এবং মন্দ আচরণ লক্ষ করি। আমাদের ইমান জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু আল্লাহ এই আয়াতে যা বলছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমান অর্জন করার আগেই জানতে হবে কোনো বিশেষ ধর্মপথ সত্য ধর্ম কি না। সেই ধর্মের বা গ্রন্থের প্লাটফর্মের মধ্যে না গিয়েও, তার বাইরে থেকেই তাকে আগে চিহ্নিত করতে হবে তা সত্য কি না।

আল্লাহ মানুষের অন্তরকে সত্য চিহ্নিত করার এই যোগ্যতা দান করেছেন ব'লেই এই যোগ্যতাকে ব্যবহার ক'রে আমরা সত্যকে চিহ্নিত

করতে পারি, এবং একবার সঠিকভাবে, নিরপেক্ষভাবে, সত্যকে চিহ্নিত করা হয়ে গেলে, সেই সত্যকে যখন আমরা গ্রহণ করব, তখন সেই সত্যের দ্বারা আমরা উপকৃত হব, এবং আমাদের দ্বারাও সেই ধর্ম উপকৃত হবে। আল্লাহর এক জ্ঞানী বান্দা আমাকে বলেছিলেন - তুমি ইসলাম ত্যাগ কর, কারণ তুমি পূর্ণাঙ্গ মানুষ নও। ইসলাম কোনো অপূর্ণাঙ্গ মানুষের জন্য নয়। ইসলাম কোনো পশু-পাখির জন্য নয়। ইসলাম মানুষের জন্য। আগে মানুষ হও, তারপর ইসলাম কবুল কর। সঙ্গে সঙ্গে তার কথা আমার অন্তরে একটি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এবং আল্লাহর অশেষ দয়ায় তার একটি কথায় আমি যেভাবে উপকৃত হয়েছি, আমার যদি দেবার মতো কিছু থাকত, তাহলে তাকে কোটি কোটি টাকা দিলেও আমার সেই ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।

এভাবে অনেক আয়াত বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ সব সময়েই চাচ্ছেন কোরআনকে আমরা যেন ইসলামে প্রবেশ করার আগেই সত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, এবং তার পরেই যেন আমরা ইসলামে প্রবেশ করি। বাপ দাদার ধর্ম তো সবাই অবলম্বন করে। কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো - তোমরা কেন সত্যকে মানতে চাচ্ছ না? তারা বলতো যে তারা তাদের বাপ-দাদাকে যে অবস্থায় পেয়েছে, সেই অবস্থায়ই রয়েছে। অর্থাৎ বাপ-দাদাদেরকে যে ধর্মের মধ্যে তারা দেখেছে, সেই ধর্মই তারা অবলম্বন করছে। সবাই তাদের প্রথা ট্রেডিশন তথা সামাজিক অতীত ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সব নবী এসে বলেছেন - আমি যদি তোমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্মের চেয়েও ভালো কিছু দেখাই, তাহলেও কি তোমরা ভালো কিছু গ্রহণ করবে না? এবং তাদের কথা এবং আচরণের মধ্য দিয়ে তারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে যে তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের বাইরে কোনো কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, আমরা ইসলাম কবুল করেছি শুধু এ

কারণে যে, ইসলামকে আমরা আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম হিসেবে পেয়েছি। যদি অন্য কোনো ধর্মে আমরা জন্মগ্রহণ করতাম, কিংবা ধর্মহীনতার মধ্যে লালিত পালিত হতাম, হয়তো বা অনেক সময়ে অন্তরের তৃষ্ণা দিয়ে কখনও সত্যকে সন্ধান করতাম না। আর অন্তরের তৃষ্ণা দিয়ে যদি সত্যকে সন্ধান করা না হয় তাহলে সেই সত্য অনুযায়ী আচরণ করলেও সেই আচরণ কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কারণ তা সত্য এ কারণে আমি তা মানছি না, আমি আসলে তা মানছি এ কারণে যে তা আমার বাপ-দাদার ধর্ম। সুতরাং আমার উদ্দেশ্যের মধ্যেই গলদ রয়ে গেছে। সুতরাং সত্যকে চিহ্নিত করার মধ্যেই আমার অপারগতা রয়ে গেছে। সেই চিহ্নিত করার অপারগতার ওপর আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং আমার সব কর্ম বিফল হয়ে যাবে।

এবার আসুন আমরা আর একটু বিস্মিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। চলুন নিচের আয়াতগুলি পড়া যাক। সূরা আনআম এর ৭৪ নং আয়াত থেকে আমরা পড়িঃ

> 'স্মরণ কর, ইব্রাহিম বলেছিলেন তার পিতা আজরকে, আপনি কি প্রতিমাগুলোকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে এবং আপনার কওমকে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

ইব্রাহিম (আ.) এর মতো ছোট শিশু এই কথাগুলি কী ক'রে বললেন? অনেকে হয়তো জবাব দিবেন এই ব'লে যে, ইব্রাহিম (আ.) কে আল্লাহ সত্য জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সেই সত্যের আলোকে তিনি মূর্তিগুলোকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, যে কারণে তার বাবাকে এই উপদেশ দিতে পেরেছিলেন, যদিও তার বাবা এই উপদেশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে দেখা যাচেছ যে ইব্রাহিম (আ.) যখন এই কথাগুলি বলছেন তখনও কিন্তু তিনি

সত্যকে ভালোভাবে জানেননি, সত্যের একটি দিক নির্দেশনা পেয়েছেন মাত্র। সত্যমুখিতা অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সত্যের জ্ঞান এখনও তার মধ্যে আসেনি। আয়াতগুলি একটু পড়া যাক:

> এরূপেই আমি ইব্রাহিমকে দেখিয়েছি আসমান ও জমিনের আশ্চর্যবস্তু সমূহকে।

কিরূপে তিনি তাঁকে সেগুলি দেখিয়েছেন? তার পরবর্তী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে:

> তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি তারকা দেখতে পেলেন এবং বললেন, এটি আমার প্রভু।

এমনভাবে আল্লাহ তাকে আকাশমণ্ডলী ও তার বিভিন্ন বস্তুরাজিকে দেখালেন, যার ফলশ্রুতিতে তার মধ্যে জ্ঞানের উদয় ঘটার কথা, কিন্তু প্রথম দিকে জ্ঞানের উদয় না ঘ'টে ঘটল ভ্রান্তির উদয়। ফলে তিনি মনে করলেন যে এই তারকাটিই তার প্রভু। তাঁকে আকাশ-মণ্ডলীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাবার পরও তিনি কেন এই ভ্রান্তির মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়লেন? এবং তারপর আল্লাহ বলছেন:

> অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, আমি অস্ত গামিদের ভালোবাসি না।

কি চমৎকার কথা! এই আয়াতের অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ইব্রাহিম (আ.) যখন তার বাবাকে মূর্তিগুলো সম্পর্কে বলেছেন, ভর্ৎসনা করেছেন, তখন আসলে তিনি সত্যকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখেননি ঠিকই, তবে অন্তরের স্বাভাবিক বিবেক বা common sense বা কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, মূর্তি কখনও মা'বুদ হতে পারে না, কারণ সে মূর্তিকে মানুষ নিজেই তৈরি করেছে, সেই মূর্তি

কথা বলতে পারে না, সেই মূর্তি কারো কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। এইভাবে তিনি তার কাণ্ডজ্ঞানকে ব্যবহার ক'রে তার বাবাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, এবং এই কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারাই প্রথমে মিথ্যাকে চিহ্নিত করেছিলেন। সত্যকে তিনি কখনও চিহ্নিত করতে পারেননি, যে কারণে তিনি তারকাকেও রব ব'লে ভুল করেছেন। এবং পরে আল্লাহ বলছেন:

> তারপর যখন তিনি চাঁদকে দীপ্তিময় অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন, এটিই আমার রব।

অর্থাৎ চাঁদকে দেখেও তিনি তার রব মনে করেছেন। এইভাবে আল্লাহ তাঁকে তাঁর ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে চালিত করতে করতে এক পর্যায়ে তাকে চেষ্টা-ভুলের পথ ধ'রে সত্যকে জানালেন।

এখান থেকে আমরা এই মহা রহস্যটি আবিষ্কার করলাম যে, আল্লাহ যদি নিজের চোখে আমাদেরকে দেখিয়ে দেন কিংবা কোনো ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেও সত্যকে দেখিয়ে দেন না কেন, সেই সত্যকে জানার আগে আমাদেরকে মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে শিখতে হবে। মিথ্যাকে চিহ্নিত ক'রে ফেললে সত্য জানতে আর খুব বেশি বাকি থাকে না। এবং এ কাজে গভীর জ্ঞানেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। ইবলিসের প্ররোচনাই হলো চরম মিথ্যা, অথচ আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে তার মাধ্যমে তাঁর যোগ্য বান্দাগণ সুপথই পেয়ে থাকেন:

> *সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার যে-সর্বশান করলে তার দোহাই! আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে (পাপকে) আকর্ষণীয় করব আর সকলের সর্বনাশ করব তোমার নির্বাচিত দাস ছাড়া।' আল্লাহ বললেন, 'এ-ই আমার কাছে পৌঁছানোর সরল পথ। বিভ্রান্ত হয়ে যারা তোমাকে*

অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার দাসের ওপর তোমার কোনো প্রভাব ঘটবে না।

(সূরা হিজর, আয়াত: ৩৯-৪২)

শয়তান ওদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেয় সে তো ছলনা মাত্র। আমার দাসদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

(সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ৬৫)

মিথ্যাকে চিহ্নিত করার জন্য শুধু দরকার সত্যের অভিমুখিতা বা মনের এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, যা কোনো জ্ঞান নয়, যা কোনো অভিজ্ঞতা থেকেও আসার প্রয়োজন নেই, যা আল্লাহ আমাদের অন্তরে প্রাকৃতিকভাবেই দান করেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা যদি মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের অন্তরকে সংরক্ষণ করতে পারব, এবং তখনই আমরা সত্যের প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠিত রূপকে চিহ্নিত করতে পারব। তারপর সেই রূপের মধ্যে এসে, সেই প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মধ্যে এসে, আমরা কিছুকাল ধর্মীয় আচরণ করার পর দেখব যে, মনের মধ্যে আরও জ্ঞানের গভীরতা সৃষ্টি হয়েছে, এবং আরও অনেক কিছু মনের মধ্যে গজিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রথম কথা হলো কোনোরূপ উপায় অবলম্বন এবং ধর্মের ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই সত্যকে চিহ্নিত করতে পারা। যে অন্তর সত্যকে এভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে, একমাত্র সেই অন্তরই কোরআনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। আর কোনো অন্তর তা পারবে না।

অনেকে এমন আছেন যারা বলেন যে কোরআনকে নতুন ক'রে প্রমাণ করতে যাওয়া অপরাধ। আসলে বিভিন্ন কারণে তারা এই কথাগুলি ব'লে থাকেন। প্রথমত, ইমানের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের মনে

অনেক দুর্বলতা কাজ করে, এবং সেই ইমানকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে আমরা অনেক সময়ে রেগে যাই, সংকীর্ণতাকে অন্তরে স্থান দেই বা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাই না। যা আমার মধ্যে আমার সন্দেহকে উষকে দিবে তা থেকে এড়িয়ে চলি। এই বিধান আমাদেরকে আল্লাহই দিয়েছেন। কারো অন্তর যদি এমন অবস্থায় বিরাজ করে যে অবস্থায় কোনো প্রশ্ন বা কোনো কটুক্তি তাকে সত্য থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তাহলে তার উচিৎ সেই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং দূরে থাকা, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার অন্তরে বিশ্বাস মজবুত হচ্ছে। এটি একটি দায়িত্ব। কিন্তু আমার অন্তর সত্যকে মিথ্যা মনে ক'রে ফেলতে পারে, এই ভয় আমার অন্তরের মধ্যে যদি আসে, তাহলে তা এটাই প্রমাণ করে যে আমার ঈমান অসম্পূর্ণ। এবং এই অসম্পূর্ণ ঈমান নিয়ে বেশি দিন থাকার কোনো বিধান নেই। আল্লাহ বলেছেন, দ্রুত আমাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। নইলে আমরা যে কোনো সময়ে ধ্বংসের মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়তে পারি।

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে ও আবার অবিশ্বাস করে, তাদের অবিশ্বাস করার ঝোঁক বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৭)

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ও যাদের অবিশ্বাসপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনও মঞ্জুর করা হয় না। আর এরাই তো পথভ্রষ্ট।

(সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ৯০)

হে বিশ্বাসীগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা

তোমাদেরকে বিশ্বাসের পর আবার অবিশ্বাসকারীদের দলভুক্ত করবে।

(সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ১০০)

সেদিন কতকগুলো মুখ সাদা হবে, আর কতকগুলো মুখ কালো হবে।। যাদের মুখ কালো হবে (তাদরেকে বলা হবে) 'বিশ্বাস করার পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা যে অবিশ্বাস করেছিলে তার জন্য শাস্তি ভোগ করো।'

(সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ১০৬)

আল্লাহ গোটা কোরআনে শতবার এই কথাটি উল্লেখ করছেন যে, যখনই কোরআন নাযিল হয়েছিল, তখন কাফেরগণ মুজিজা বা অলৌকিক কাণ্ডখারখানা দাবি করত। তারা বলত যে তাদেরকে যদি অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখানো হয়, তাহলে তারা স্বীকার করবে যে কোরআন সত্য। কিন্তু আল্লাহ এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখাতে নারাজ। এবং তার ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি এ-ও বললেন যে, পূর্ববর্তী অনেক নবীকে মুজিজা বা অলৌকিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, যা তারা তাদের অনুসারীদের সামনে প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু সেই মুজিজার কারণেও মানুষের ইমান আসেনি, এবং এক পর্যায়ে সেই মুজিজা মানুষের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে - Familirity breeds contempt. কোনো কিছুর সঙ্গে খুব বেশি পরিচয় হয়ে গেলে তাকে আমরা নতুন কিছু বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবতে প্রস্তুত থাকি না। মনে ক'রে ফেলি যে এ বিষয়টি আমার জানা, ফলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এই ভাবে মুজিজা দেখতে দেখতে তাদের চোখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এক পর্যায়ে বিশ্বাস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই আল্লাহ রসূল (স.) কে বলছেন - তোমার দায়িত্ব শুধু সত্যকে প্রচার করা। কে মানলো, কি মানলো না,

সেটা আল্লাহর ব্যাপার। এবং যে মানবে সে নিজের জন্যই মানবে আর যে মানবে না, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমাদের প্রশ্ন হলো: সত্যকে সহজভাবে প্রকাশ ক'রে দেয়া হলো এবং তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হলো না, তা সত্য কি মিথ্যা তাও প্রমাণ করা হলো না, অথচ সত্যকে চিনতে আমি যদি ভুল করি তাহলে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হবে - এ কেমন কথা?

আসলে এখানে একটি রহস্য লুকিয়ে আছে। আমরা একটু আগে যেমন বলেছিলাম, অন্তরের তৃষ্ণা। যার অন্তর সত্যকে জানার জন্য তৃষ্ণার্ত নয় তাকে সত্য খাইয়ে দিলেও সে তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। ইংরেজিতে একটি কথা আছে - You can take a horse to water but you cannot make it drink. তুমি ঘোড়াকে পানির কাছে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু পান করাতে পার না। সে পানি পান করবে কি না করবে তা নির্ভর করবে তার তৃষ্ণার ওপর। সত্যের প্রতি আমাদের যদি কোনো তৃষ্ণা না থাকে, তাহলে সেই সত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করার পরেও আমাদের কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হবে না।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো - এই তৃষ্ণা জাগার পর আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে যে সত্য কোনটি। কিভাবে সেই চিহ্নিত করার কাজটি আমরা করব? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা কোরআন ঘাটলে এই তথ্যটি পেয়ে যাচ্ছি যে, রসূল (স.) এর ওপর যত অলৌকিক ক্ষমতা নাযিল হয়েছিল, বা রসূল (স.) এর যত আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল, তার যত কিছু তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, তার সবকিছুর ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রেও আমরা কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে হয়তো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। কারণ অলৌকিক কাণ্ডকারখানার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আল্লাহ বলেছেন যে, এই কোরআনই শ্রেষ্ঠ অলৌকিক। এই

কথাটি যদি আমরা বুঝতে পারতাম, তাহলে মুজিজার কোনো প্রয়োজন হতো না। এবং আল্লাহ আরও বলছেন যে, প্রমাণ নিজেই একটি মুজিজা। ৬ নম্বর সূরার ৫৭ নম্বর আয়াতটি আমরা একটু পড়ি:

> বলুন আমি তো আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ তোমরা তা অস্বীকার করছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাইছ তা আমার কাছে নেই। কর্তৃত্ব তো শুধু আল্লাহর। তিনি তো সত্য বর্ণনা করেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

এখানে রসূল (স.) বলছেন যে, তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই প্রমাণ যদি কারো অন্তরে সঠিক তৃষ্ণা জাগাতে না পারে, বা তৃষ্ণা মেটাতে না পারে, বা অন্তরে সত্যের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে অন্য কোনো মুজিজা তা পারবে না। কারণ মানুষ এমনই এক জীব যে, সে কোনো অলৌকিক ক্ষমতাটি যদি চোখের সামনে দেখে, তার চোখ ভোতা হয়ে যাবে, এক পর্যায়ে তা তার কাছে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু সে তার অন্তরের যুক্তি-তর্ক এবং চিন্তাশক্তি প্রয়োগ ক'রে যদি কখনও সত্যকে দেখে, সেই দেখা দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকবে, কখনোই কমবে না। এসব কারণে আমরা স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যারা বলে যে কোরআনকে নতুন ক'রে প্রমাণ করার কিছু নেই, আগে থেকেই তারা তা গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন, তাদের কথা সঠিক নয়, কারণ তাদের অনেকেই ব'লে থাকেন যে, যেই তারা নামাজে দাঁড়ান, তখন তাদের মন অস্পষ্ট হয়ে যায়। মনের সমস্ত পর্দা এবং চিন্তা ভাবনাগুলো সামনে এসে দাঁড়ায়। এই দাঁড়ানোতে কোনো অপরাধ নেই। এটা নামাজের অলৌকিতার প্রমাণ। কারণ অন্য কোনো সময়ে আমাদের মনে এই চিন্তাগুলি আসে না, কিন্তু নামাজের

সময়ে আসে। এটাই প্রমাণ করে নামাজ কোনো জাগতিক কর্মকাণ্ড নয়, এবং এটা মানুষের সৃষ্ট কোনো আচরণবিধি নয়।

তবে অন্য কোনো সময়ে সচরাচর সন্দেহ এসে হাজির না হলেও নামাজের মধ্যেই এই সন্দেহ এসে হাজির হয়। এটাই প্রমাণ করে যে সেই মনে সন্দেহ রয়ে গেছে, কম হোক আর বেশি হোক। সুতরাং সে যতই মনের ওপর জোর খাটিয়ে কোরআনকে আঁকড়ে ধরুক না কেন, তার সন্দেহকে সে কখনোই দূর করতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে যে, কোরআন নিজেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অলৌকিক। এবং তা পর্যবেক্ষণ করা মানেই কোরআন যে মানুষের রচনা নয় তা স্পষ্টভাবে নিজের কাছে প্রমাণ করা। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মনে করি যে, কোনো একটি বিশেষ আয়াতের সাথে বিজ্ঞানের কোনো একটি বিশেষ আবিষ্কারের সাথে মিল পাওয়া গেছে, সুতরাং কোরআন সত্য। আসলে এটি কোনো প্রামাণ নয়। এটি আমাদের অন্তরের একটি কনভিক্শন বা প্রতীতী যা আস্থা দান করতে পারে, বা আপনার ক্ষেত্রে তা ব্যক্তিগত প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে, কারণ আপনার মন ইতোমধ্যেই অন্যান্য অনেক তথ্য গ্রহণ ক'রে ফেলেছে, এবং আপনার মন সত্যকে গ্রহণ করার জন্য অনেকখানি প্রস্তুত হয়ে গেছে, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে তা আদৌ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না। তা যদি হতো, তাহলে পৃথিবীর জাগতিক অর্থে যে সব জ্ঞানীগুণি আছেন তারা সবাই মুসলমান হয়ে যেতেন। কারণ এই পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখাতে যত কিছু নতুন আবিষ্কার হয়েছে, তার সবই কোরআনে পাওয়া গেছে।

এবার আসুন ৬ নম্বর সূরার ৩৭ নম্বর আয়াতটিকে আমরা একটু বিবেচনা করি।

> তারা বলে, কেন তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক কাণ্ড নাযিল করা হয়নি? বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অলৌকিক কাণ্ড নাযিল করতে পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

অবিশ্বাসীরা প্রশ্ন করত যে মুহাম্মদ (স.) এর ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে, কিন্তু এই কোরআন যে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে, তার প্রমাণ হিসেবে অন্য কিছু নাযিল হয়নি কেন? তখন আল্লাহ রসূল (স.) কে বলতে শিখিয়ে দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অলৌকিক কাণ্ড নাযিল করতে সক্ষম। আল্লাহ যে সক্ষম এই ব্যাপারে শুধু তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু তার সক্ষমতার ফলস্বরূপ তিনি কোনো অলৌকিক কাণ্ড নাযিল করেছেন না। এবং আল্লাহ যে সক্ষম, এটুকু ব'লে তিনি থেমে যাচেছন, তার চেয়ে বেশি কিছু বলতেও চাচ্ছেন না। আর আল্লাহর এই সক্ষমতাই যেন সবকিছু হয়ে গেল। আমাদের চোখের সামনে চাক্ষুসভাবে যদি প্রমাণ না দেখানো হয়, এবং তারপর যদি আমরা তা অবিশ্বাস করি, তাহলে আমাদেরকে কেন দোষী সাব্যস্ত করা হবে? আসলে আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে কেন? - সেই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর চমৎকার জবাব রয়েছে। আমাদের এই চিন্ত াশক্তিও আমাদের ওপর অর্পিত সবচেয়ে বড় আমানত। আমাদের এই বিশ্লেষণ শক্তিই আমাদের বড় আমানত। এই চিন্তাশক্তির ও বিশ্লেষণ শক্তির চোখ দিয়ে আমরা যদি কোনো সত্যকে না দেখি, এবং সেই দেখার তৃষ্ণা যদি আমাদের মাঝে না জাগে, তাহলে অলৌকিক কাণ্ড দেখে বাইরের চোখের তৃষ্ণা মেটানোর অধিকার আমাদের নেই। কারণ বাইরের চোখ প্রত্যেকটি প্রাণীরই আছে। সমস্ত প্রাণী যা দেখে, আমরাও তাই দেখি। হয়তো অনেক সময়ে প্রাণীরাই বেশি দেখে, আমরা কম দেখি। এই অর্থে বাইরের কান দিয়ে আমরা যা শুনি, প্রাণীরা তার চেয়ে বেশি শোনে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুজিজা নাযিল করতে পুরোপুরি সক্ষম। তারপর তিনি কী বলছেন তা একটু লক্ষ করি।

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

আল্লাহ যে সক্ষম তা তারা জানে না। আর আল্লাহই যে সক্ষম তা তারা কিভাবে জানবে? তারা তো আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং জানার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে আল্লাহ কেন এভাবে কথা বলছেন? এই বিষয়টি বুঝতে হবে। আসলে আল্লাহ যে মুজিজা নাযিল করতে পূর্ণভাবে সক্ষম তা তারা জানতে পারত, যদি এই কোরআন যে মানুষের রচনা নয় সে ব্যাপারে তারা স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যেত। তাহলে তারা বুঝতে পারত যে কোরআনই শ্রেষ্ঠ মুজিজা এবং এই জাতীয় মুজিজা যার দ্বারা নাযিল করা সম্ভব, তার দ্বারা যে কোনো মুজিজাই নাযিল করা সম্ভব। এই জন্যে আল্লাহ বলছেন যে, তারা অধিকাংশই জানে না।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে কোরআন যে সত্য তা স্পষ্টভাবে কোরআনের ওপর ভিত্তি ক'রে নিজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা না হলে আমাদের সেই ইমান নড়ব'ড়ে হয়ে যাবে এবং সেই ইমান যে কোনো সময়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এবং প্রমাণ ব'লে আমরা কী বোঝাচ্ছি সেদিকেও একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমরা প্রমাণ বলতে এমন প্রমাণ বোঝাচ্ছি যা অস্বীকার করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির নেই। হয়তো কোনো ব্যক্তি বলতে পারে - আমি এটা মানি না। সেটা হতে পারে, কিন্তু এই প্রমাণ একবার তার দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর সে অস্বীকার করতে পারবে না যে কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়। তাহলে কোরআন কার বাণী? এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই। কোরআন যদি কোনো মানুষের বাণী না হয় তাহলে এটা কার বাণী সে সম্পর্কে অন্তর নিজেই তার জবাব খুঁজে নেবে।

আমরা ৬ নম্বর সূরার ১০৪ থেকে ১০৫ নাম্বার আয়াত দু'টি একটু পড়িঃ আল্লাহ বলছেনঃ

> অবশ্যই এসে গেছে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট *প্রমাণসমূহ*। অতএব যে কেউ তা *দেখবে*, সে তো নিজেরই উপকার করবে।

কি চমৎকারভাবে আল্লাহ বলছেন - তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সে প্রমাণ কি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বা মুজিজা? তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি! তাহলে প্রমাণ হিসেবে কী এসেছে। কোরআন নিজেই তার প্রমাণ। এই জন্য আল্লাহ বলছেনঃ যে কেউ তা দেখবে, সে নিজেরই উপকার করবে। আল্লাহ এই প্রমাণ দেখার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন, এবং না দেখলে তাকে ধিক্কার দিচ্ছেন। নিজের চোখে দেখতে হবে এই কোরআন অলৌকিক কাণ্ড কি না। তাই আল্লাহ বলছেন যে তা না দেখে অন্ধত্ব বেছে নেবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

তারপর তিনি বলছেনঃ

এমনিভাবে আমি *প্রমাণসমূহ* বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করি, যাতে তারা বলে, তুমি তো প'ড়েই নিয়েছ, এবং যাতে আমি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রে দেই, তাদের জন্য যারা *জানে*।

এখানে আল্লাহ বলেননি - যারা বিশ্বাস করে, বরং তিনি বলেছেন - যারা জানে। এর আগেও আমরা একটি আয়াত দেখেছি যে আল্লাহ *জ্ঞানের* উওপরেই *বিশ্বাসকে* স্থাপিত করেছেন। এখানেও ঠিক তাই দেখলাম। আগে জ্ঞান থাকতে হবে, এবং পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করার মাধ্যমে, নিশ্ছিদ্র প্রমাণ সহকারে জানতে হবে যে কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়। তখনই কিন্তু

আমাদের অন্তরের তৃষ্ণার হক আদায় হবে। তার আগ পর্যন্ত কখনোই তা আদায় হবে না। গোটা কোরআন মুখস্থ করলেও না। এবং তা নিয়ে সারা জীবন ধর্ম প্রচার করলেও না। জানতে হবে এটা কেন সত্য?

একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে পারলে তোমরা এরকম দশটি সূরা বা দশটি আয়াত রচনা ক'রে নিয়ে এস। তারপর আল্লাহ এ-ও বলছেন যে সারা পৃথিবীর জ্বীন ও মানব জাতি সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও এর মতো কোনো সূরা আনতে পারবে না। ঠিক এই চ্যালেঞ্জটি যখন আমরা বিবেচনা করি, তখন আমাদের প্রথম দৃষ্টি চ'লে যায় কোরআনের রচনারীতি, বাণীভঙ্গীর দিকে। কারণ আল্লাহ এই জাতীয় কথা যখনই বলেছেন, তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোরআনের বাণী দেখেই বোঝা সম্ভব যে, তা কোনো মানুষের বাণী নয়। আর যেহেতু তা মানুষের বাণী নয়, যেহেতু মানুষের ভাষার ব্যবহারের অভ্যাসের মধ্যে এটি পড়ে না, সেহেতু কোনো মানুষ এ রচনা করতে পারবে না। এবং আমাদের এই কথার সত্যতা হিসেবে আমরা একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। রসূল (স.) কে যখন কোরআনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করা হতো, তখন তিনি আল্লাহর আদেশে সবার ওপর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। তিনি কা'বা ঘরের দরজায় কোরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটির প্রথম দু'টি লাইন লিখে দিলেন - 'ইন্না আ'তইনা কাল কাউসার - ফাসল্লিলি রব্বিকা অনহার'। এবং বললেন - পারলে তৃতীয় লাইনটি কেউ লিখে দেখাক। এটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এবং সবাই এসে কা'বা শরীফের দরজায় লিখিত এই লাইন দু'টি পড়তে লাগল এবং কেউ এর তৃতীয় লাইন লেখার সাহস পেল না। ঐ সময়কার সবচেয়ে বড় আরবি কবি ছিলেন লোবিদ (রা.)। তিনি লাইন দু'টি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষারীতির মধ্যে কি যেন এক রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তার মধ্যে একটি আলো জ্বলে

উঠেছিল, যে কারণে তিনি তৃতীয় লাইন হিসেবে নিজেই লিখে দিয়েছিলেন - 'লাইছা হাজা লা কালামুন বাসার' - এ কোনো মানুষের বাণী নয়। তিনি মাত্র দুটি বাক্য দেখে কী বুঝেছিলেন, কী দেখেছিলেন, যার ভিত্তিতে তিনি বুঝলেন যে এটা কোনো মানুষের বাণী নয়? নিশ্চয় তিনি ঐ দুটি বাক্যের সঙ্গে বিজ্ঞানকে মিলাননি, গণিতকে মিলাননি, বা অন্যান্য জ্ঞানের কোনো শাখার সঙ্গে তাদেরকে তুলনা করেননি। তাহলে কী দেখেছিলেন?

আসলে তিনি কোরআনের বাণীরীতির প্রতি লক্ষ করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি কবি ছিলেন, তার ভাষার সমস্ত বাণীরীতির অলিগলিতে তার যাতায়াত ছিল, তার অন্তর সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিল, সেহেতু তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বাণীরীতি কোনো মানুষের বাণী নয়। এবং কোনো মানুষ চেষ্টা ক'রেও এ রকম কোনো কিছু লিখতে পারবে না।

সুতরাং অন্তরের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সবাইকে সন্দেহাতীতভাবে জানতে হবে যে কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়। এই প্রমাণ পৃথিবীতে আজও কোথাও কেউ করেননি। সৌদি আরবে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন সত্য কি মিথ্যা সে বিষয়ে কিছু কোর্স করানো হয়। এবং সেই কোর্সের মধ্যে কেবল কারআনের সাহিত্যিক দিকগুলির বিশ্লেষণ থাকে। যেমন, বিগত এক হাজার বছরের আরবি সাহিত্যকে বিশ্লেষণ ক'রে তারা সেই সাহিত্যের বিশেষ কিছু প্যাটার্ন লিপিবদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে কোরআনের এক গুচ্ছ আয়াতকে বিশ্লেষণ ক'রে, কিংবা গোটা কোরআনের সমস্ত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপস্থাপনের ভঙ্গিকে বিশ্লেষণ ক'রে, তারা আর একটি তালিকা তৈরি করেন, এবং দুই তালিকার মধ্যে মিলিয়ে দেখেন যে আরবি সাহিত্যের যতগুলি ধারা রয়েছে, যেমন চারটি বা পাঁচটি, তার

চেয়ে বহুগুণ বেশি ধারা রয়েছে কোরআনের বর্ণনারীতির মধ্যে, যেমন ১৪টি বা ১৫টি। এই আলোকে তারা বলেন যে, এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়।

তাদের এই উপস্থাপন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদেরকে একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে: মানুষের জ্ঞানের সব শাখার সঙ্গে আমরা কোরআনকে তুলনা করতে পারি এবং সেভাবে কোরআন যে কেন আলাদা তা পর্যবেক্ষণ ক'রে আমরা সত্যকে চিহ্নিত করতে পারি - এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে যদি অন্য ব্যক্তিগণ বলেন যে শুধু আরবি সাহিত্য কেন, আমাদের সাহিত্য কেন বিবেচনা করা হয়নি? আমরা এই প্রমাণকে ইউনিভার্সাল হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নই, কারণ কোরআন শুধু আরবি ভাষীদের জন্য নাযিল হয়নি, যদিও তা আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে - বরং তা ইউনিভার্সাল গ্রন্থ, সেহেতু গোটা মহাবিশ্বের সমস্ত সাহিত্যের ধারাকে বিশ্লেষণ ক'রেও একই ফল পাওয়ার কথা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই জাতীয় কোনো গবেষণা আজও করা হয়নি। এবং অনেক ক্ষেত্রেই যারা বিভিন্ন গবেষণার জন্য অর্থকড়ি যোগান দিয়ে থাকেন, তারা এই বিষয়ে হয়তো বা কিছু বেশি ভাবেন না - তাদের অন্যান্য ব্যস্ততা রয়েছে, যে কারণে এ জিনিষটি ঢাকা প'ড়ে গেছে।

তবে কোরআনের সঠিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো তার বাণীরীতির ভিত্তিতে, তার ভাষাতাত্ত্বিক উপস্থাপনার ভিত্তিতে। এই প্রমাণ আল্লাহ তাআলা আমাকে করার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এবং বাকি জীবন আমি যদি কিছু নাও পাই, তবুও আমার এই কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না। এবং এই বিষয়টিকে সবার নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একটি সফ্টওয়ার তৈরি

করেছি এবং এভাবে ২০টি থেকে ২৫টি সফ্‌টওয়ার তৈরির ইচ্ছা আমার রয়েছে। যেখানে আমি একশ'র বেশি বিভিন্ন উপায়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে, কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়। যে কোনো প্রমাণ অন্য যে কোনো একটি প্রমাণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এবং তার ওপর নির্ভরশীল নয়। ফলে একটি মানুষের বিশ্বাসী হওয়ার জন্য যে কোনো একটি প্রমাণই যথেষ্ট। তবে যার যত বেশি প্রমাণ লাভ করার যোগ্যতা ও সুযোগ হবে, তার বিশ্বাস তত বেশি বাড়বে এবং এভাবে এক পর্যায়ে আমাদের অন্তরের সমস্ত ঝাঁপসা ভাব দূর হয়ে যাবে। এই সফ্‌টওয়ারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ফ্রি সংগ্রহ করা যাবে।

যা হোক, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, কোরআন যে আল্লাহর বাণী এ বিষয়ে নিজের কাছে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। তা না করা পর্যন্ত আমি যাই করব না কেন, তার মধ্যে অপূর্ণাঙ্গতা, অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে, এবং কোনো না কোনো পর্যায়ে আমার সেই ইমান যে ধ্বংস হয়ে যাবে না, এই নিশ্চয়তা কখনোই আমি পাব না।

কোরআন যে শ্রেষ্ঠ অলৌকিক, এ কথাটি কোনো বিশ্বাসের বস্তু নয়, বরং জানার বস্তু। যদি কেউ সচেতনভাবে এই বিষয়টি না জানতে পারে যে কোরআন কোনো মানুষের রচনা নয়, তাহলে তার এই বিশ্বাসে কোনো কাজ হবে না যে, কোরআন একটি শ্রেষ্ঠ অলৌকিক। আমরা বিষয়টাকে আর একটু খোলসা ক'রে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। ধরা যাক আমি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম - কোরআন সত্য। এবং আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে - কিসের ভিত্তিতে তুমি বলছ কোরআন সত্য? এবং আমি যদি তার সঠিক কোনো জবাব না দিতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে যে আমি কোনো না কোনো কারণে আন্দাজে বা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোরআনের পক্ষে চ'লে গেছি। যদি কোনো সঙ্গত কারণ না থাকে, তাহলে এই

রকম আন্দাজে বিশ্বাস কোথাও গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এ কারণে কাফেররা সব সময়ে অলৌকিক কাণ্ডের দাবি করত, যা না দেখে তারা বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ মুজিজা প্রদর্শনকে একেবারেই অপছন্দের বিষয় হিসেবে নিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, কোরআনই যে শ্রেষ্ঠ মুজিজা তা যদি স্পষ্টভাবে তারা না জানতে পারে, তাহলে অন্য কোনো মুজিজা দেখে তাদের কোনো লাভ হবে না। ৬ নং সূরার ৩৪ এবং ৩৫ নং আয়াত দু'টি আমরা পড়ি। এখানে আল্লাহ বলছেন:

> আপনার পূর্ববর্তী অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেছেন। মিথ্যাবাদী বলা এবং নির্যাতিত করা সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে আর আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। অবশ্যই আপনার কাছে এসেছে পয়গম্বরদের কিছু ইতিবৃত্ত। আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার কাছে অসহনীয় হয়, তবে পারলে জমিনে কোনো সুড়ঙ্গ পথ কিংবা আসমানে কোনো সিঁড়ি অন্বেষণ ক'রে নিন। তারপর নিয়ে আসুন তাদের জন্য কোনো অলৌকিক কাণ্ড। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাদের সবাইকে অবশ্যই সৎপথে একত্র ক'রে দিতেন। অতএব আপনি অজ্ঞ, মূর্খদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

এখানে একটু সাবধানে এগোতে হবে। আল্লাহ বলছেন - আপনার পূর্ববর্তী অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেছে। ধৈর্যের প্রয়োজনটা কেন? আমাকে কেউ মিথ্যাবাদী বললে আমাকে কেন ধৈর্যধারণ করতে হবে? তার মুখে সে বলেছে, তাতে আমার কী? আসলে এখানে ধৈর্য ধারণের প্রসঙ্গটি এ কারণে আসছে যে, কোনো নবীকে যখন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তখন তিনি বলেছেন

যে তা যে সত্য তা তিনি নিজেই জানেন, এবং এ কারণে সেই সত্যের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনে তিনি হয়তো কামনা করেছেন যে, এর সঙ্গে কোনো অলৌকিক কর্মকারখানাও নাযিল হোক, যা দেখে তারা সত্যকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ এই বিষয়টি পছন্দ করেন না, কারণ সত্যের ওপর মর্যাদাসম্পন্ন আর কিছু নেই। সেই সত্যকেই যদি অন্য কিছুর দ্বারা চিহ্নিত করতে হলো, সেই সত্যকেই যদি কোনো অলৌকিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে হলো, তাহলে সত্যের অনুসরণের কোনো প্রয়োজন না-ও থাকতে পারে। **সত্যকে সত্য ব'লে চেনা সম্ভব একমাত্র ঐ সত্যকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেই, অন্য কোনো কিছুর সাহায্য গ্রহণ ক'রে ঐ সত্যকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে নয়। তা যদি করা হতো, তাহলে যার দ্বারা সত্যকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার মূল্য সত্যের চেয়ে বড় হয়ে যেত**। তাই আল্লাহ বলছেন মিথ্যাবাদী বলা ও নির্যাতিত করা সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য পৌঁছায় ততক্ষণ ধৈর্য ধর। এবং ৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন: আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার কাছে অসহনীয় মনে হয়, তাহলে পারলে জমিনে কোনো সুড়ঙ্গ পথ খুলে ফেলুন, না হয় আকাশে আহরণ ক'রে কোনো গোপন জায়গা থেকে কোনো অলৌকিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে এসে তাদেরকে দেখান। এইভাবে আল্লাহ ভর্ৎসনার সুরে কথা বলছেন শুধু এই কারণে যে, রসূল (স.) যেন কোরআন ছাড়া এর বাইরে অন্য কোনো অলৌকিক কাণ্ডের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী না হন। তাই আল্লাহ বলছেন - আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তাদের সবাইকে অবশ্যই বিশ্বাসী ক'রে দিতেন। তিনি জবরদস্তির মাধ্যমে যদি চাইতেন, তবে তা পারতেন আর তিনি যদি কোনো মুজিজা অবলম্বন করার মাধ্যমে তা চাইতেন, এবং তাদের মনের ওপরে কোনো হস্তক্ষেপ না করতেন, তাহলে তা সংঘটিত হতো না, কারণ এর আগে অনেক নবী রসূলের ক্ষেত্রে অনেক মুজিজা নাযিল হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাদের কোনো কাজ হয়নি। এবং এর পরে ৩৫

নম্বর আয়াতে যা বলা হচ্ছে তা অত্যন্ত শক্তিশালী ওষুধ হিসাবে আমাদের অন্তরে কাজ করতে পারে। আল্লাহ বলছেন: তারাই ডাকে সাড়া দেয় যারা আন্তরিকতার সাথে **শ্রবণ করে**। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! আপনি আমাকে ডাকলে আমি যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেই, অর্থাৎ আমি যদি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ না করি, তাহলে কিন্তু আমি দূরেই রয়ে গেলাম। কিন্তু এই দূরে থাকা অবস্থায় আমার মধ্যে একটি ধর্ম থাকা সম্ভব এবং সেই ধর্ম থাকা সম্ভব ব'লেই সেই ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি যা শ্রবণ করব, আপনার যে কথা অন্ত রের তৃষ্ণা দিয়ে গিলব, তখন তা আমার ওপর প্রভাব ফেলবে, আর আপনার কথা অনুযায়ী তখন আমি ধর্মের ছায়াতলে প্রবেশ করব, এবং তখনই আমি সত্যের দ্বারা উপকৃত হব। তাই আল্লাহ বলছেন - তারাই ডাকে সাড়া দেয়, যারা আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করে।

আমরা কিন্তু শুনতেই শিখিনি। অধিকাংশ সময়ে আমরা শুধু বলতেই চাই, অন্যের কথা শুনতে চাই না। আবার যখন শুনি, আমরা যা শুনতে চাই শুধু তাই শুনি, বাস্তবে যা বলা হয়েছে আমরা আর শুনি না। এ কথা আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে রসূল (স.) কে বলেছেন:

তোমার কথা যখন ওরা কান পেতে শোনে, তখন কেন তা কান পেতে শোনে, সেই ব্যাপারে আমি জানি। অর্থাৎ তারা কেন শুনবে সেই উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে আগে থেকেই প্রস্তুত। সুতরাং তারা যতই নতুন কথা শুনুক না কেন, তারা তাদের উদ্দেশ্যের বাইরে কিছুই শুনতে পাবে না। এবং তাই আল্লাহ বলছেন - আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত ক'রে উঠাবেন। তারপর তারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

একটি রহস্যময় আয়াত: মৃতদেরকে যে জীবিত করবেন তা আমরা স্বাভাবিক ধর্মের বিশ্বাস থেকেও জানি। এবং অনেক আয়াতে এটা বলা

হয়েছে। কিন্তু এই প্রসংগে ছোট্ট একটি আয়াতের মধ্যে এভাবে মৃতদেরকে জীবিত ক'রে ওঠানোর প্রসংগটি কেন টানা হয়েছে? যেখানে আয়াতটি নাযিল হয়েছে শ্রবণ করার প্রসঙ্গে সেখানে মৃতকে জীবিত করার কথাটির অর্থ কী হতে পারে? আসলে যারা শ্রবণ করে, তৃষ্ণা দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করে, তারা তাদের মৃত অন্তরকে জীবিত ক'রে ফেলে, এবং তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, আগে কোরআনের সত্যতা সম্বন্ধে জানতে হবে। তারপর নিজের মধ্যে আন্তরিকতার সৃষ্টি করতে হবে। সেই আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলে অন্তর অনেক খানা-পিনা পেয়ে যাবে, অনেক পুষ্টি পেয়ে যাবে, যা আমাদের ইমানের স্বাস্থ্য বর্ধন করবে।

(চিন্তার মেঘ)

মেঘ যেমন চাঁদকে বা সূর্যকে ঢেকে রাখে, সেই চাঁদ বা সূর্যের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মেঘের কারণে যেমন আমরা তাকে দেখতে পাই না, তেমনি আমাদের অন্ত:করণ এবং আমাদের অনুসন্ধানের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের চিন্তা। যে কোনো ব্যক্তির মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে - চিন্তাই তো সত্যকে জানার উপায়। তাহলে চিন্তা কেন সত্যকে জানার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে? আমাদের জবাব খুব বিস্তারিত এবং একটু পরে ইনশাল্লাহ সমস্ত জবাবকে উপস্থাপন করা হবে। কিন্তু তার আগে সংক্ষেপে এটুকু ব'লে নিতে পারি যে, চিন্তাকে অপসারণ করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ আপনি যদি চিন্তাকে অপসারণ করতে চান, তাহলে চিন্তার মাধ্যমেই তা করতে চাইবেন। সুতরাং চিন্তা রয়েই যাবে। এই কারণে কিন্তু নামাজের মধ্যে আমরা মনের অস্পষ্টতায় ভুগি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা অসহায় হয়ে যাই। অনেক ক্ষেত্রে আমরা হতাশ হয়ে মনের সেই অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করি। কিন্তু আমি মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি কী দিয়ে? মন দিয়ে। আর্থাৎ মন রয়েই যাচ্ছে। আর মনই হলো আমার আর নামাজের মধ্যে সেই দূরত্ব। সুতরাং আমরা আসল সত্যটির প্রতি দৃষ্টি দিব। আমরা বলব যে, চিন্তা দ্বারা যেমন সত্যকে নির্দেশ করা যায়, সত্য কোথায় আছে তা চিহ্নিত করা যায় তেমনি সেই চিন্তাই আমাদেরকে সত্যের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

বিষয়টি আর একটু উদাহরণ সহকারে বোঝানো যাক। ধরা যাক আপনি কোনো একটি জায়গা থেকে বাসে চ'ড়ে বা অনুরূপ কোনো যানবাহনে চ'ড়ে বর্তমান যেখানে আছেন সেখানেই এসেছেন। আমাদের প্রশ্ন হলো: আপনি যখন বাস থেকে নেমেছেন, তখন বাসটিকে কি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসেছেন? বা আপনাকে কি বার বার বাসটির কথা স্মরণ করতে হয়েছে? আসলে আমরা যাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি, তাকে ঠিক সেই সময় পর্যন্ত আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন হয়, যে সময় পর্যন্ত তার ওপর আমরা নির্ভরশীল থাকি। যেমন আমরা নদী পার হওয়ার পরে খেয়া নৌকাটিকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাই না। চিন্তা হলো, অন্তত সত্যকে পাওয়া না পাওয়ার নিরীখে বলতে হয়, এরূপ একটি বাহন, যাতে চ'ড়ে আমাদের অন্ত :করণ একটি বিশেষ অবস্থানে পৌঁছায়। এবং সেই অবস্থান থেকে চিহ্নিত করা যায় সত্য কোনটা আর মিথ্যা কোনটা। কিন্তু এই চিন্তাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত সেই অবস্থানে পৌঁছানো যায় না। আর এ কারণে চিন্তা মনের মধ্যে কুয়াশা, মেঘ, ধোঁয়াটে আবরণ ইত্যাদির মতো কাজ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে মনের মধ্যে এই চিন্তার উদ্ভব কেন ঘটেছে? এই ঝামেলাজনক জিনিষ আমাদের মনের মধ্যে কেন দেয়া হয়েছে? খুব সহজে আমরা জবাবটা দিতে পারি। আমাদেরকে চিন্তা নামক কোনো ব্যাধি দেয়া হয়নি, আমাদেরকে চিন্তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো না কোনো কারণে, অজ্ঞতার কারণে হোক আর অভিজ্ঞতার অভাবে হোক, আমরা চিন্তাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি না। ফলে বেঠিক জায়গায় চিন্তাগুলো বর্ষাকালের গাছপালার মতো মনের মধ্যে দ্রুত সতেজ হয়ে গজিয়ে ওঠে।

একটি বিষয় এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য - চিন্তা এবং জ্ঞান কিন্তু এক কথা নয়। চিন্তা হলো তথ্য আহরণের মানসিক প্রচেষ্টা ও যোগ্যতা।

জ্ঞান হলো একটি মানসিক অর্জন। চিন্তার যোগ্যতা প্রয়োগ করার পর আমরা জগৎ থেকে বা অন্তরের ভেতর থেকে যে তথ্যগুলি পাই, সেই তথ্যগুলির সঞ্চিত রূপই হলো জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞান হলো এক ধরনের সঞ্চয়। আর তা যেহেতু সঞ্চয়, সেহেতু তা কোনা বর্তমান নয় - তা অতীত। এই কারণে জ্ঞানের ওপর ভিত্তি ক'রে আমরা যাকে জানতে পারি, বা দেখতে পারি, তা এক সেকেণ্ডের দূরত্বে হলেও আমাদের থেকে দূরেই রয়ে গেছে - তা অতীত, বর্তমান নয়। জ্ঞানও কিন্তু আমাদের অন্তরের এবং সত্যের মাঝামাঝি দূরত্ব সৃষ্টি ক'রে রাখে। অথচ এই জ্ঞানকেই সত্য সন্ধানের ব্যাপারে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়। এ কারণে আমরা যদি চিন্তা এবং জ্ঞানের এই দ্বৈত স্বভাব বিশ্লেষণ করতে পারি, এবং তার যথাযথ কারণ জানতে পারি, তাহলে আমাদের অন্তরের অনেক সংকীর্ণতা এবং চেপে-আসা-ভাব দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ রসূল (স.) কে চমৎকার ক'রে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - আমি কি তোমার বক্ষ উন্মোচন করিনি?

আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করি নি?

(সূরা ইন্‌শিরাহ্‌, আয়াত: ১)

অর্থাৎ বুকের সংকীর্ণবোধকে আমি কি বিশালতায়, অসীমতায় রূপান্তরিত করিনি? সংকীর্ণতাবোধকে দূর ক'রে সেখানে বিশালতার অনুভব স্থাপিত করিনি? এই কাজ তিনি কিভাবে করেছেন তা আমরা ইতিহাস থেকে জানি। কয়েক বার ক'রে রসূল (স.) এর বুকে কুদরতি কায়দায় অপারেশন চালিয়ে হৃদযন্ত্র পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরাও আমাদের অনুসন্ধান এবং সঠিক অভিজ্ঞতালব্ধ এবং কোরআন সমর্থিত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই একই কাজ করতে পারি। রসূল (স.) যে রহমতগুলো পেয়েছেন, আমরা সবাই তার অংশীদার। আমাদের জন্যই, আমাদেরকে স্মরণে রেখেই আল্লাহ তাঁকে তা দিয়েছেন এবং

তিনি সেই রহমতগুলো যখন ভোগ করেছেন, তখন আমাদেরকে ভোলেননি।

অর্থাৎ আমাদের একটিমাত্র উপায় সামনে খোলা আছে - তা হলো, নিজেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে নিজের ভেতরকার শক্তি প্রবণতা ইত্যাদির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এ ছাড়া বাহ্যিক জ্ঞানে আমাদের ধর্ম, ধর্মবোধ, অন্তর ইত্যাদির কোনো উপকার হবে না। কিন্তু বাহ্যিক জ্ঞানের স্থান জীবনের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। তাকে বাদ দেয়ার কোনো যুক্তি নেই, বরং তাকে আল্লাহর জ্ঞান নয় বিবেচনা ক'রে মানুষের জ্ঞান ব'লে আখ্যায়িত করারও কোনো যুক্তি নেই। সব জ্ঞানই আল্লাহর তরফ থেকে। কিন্তু আমাদের আফসোস জাগে তখন, যখন মানুষ বাহ্যিক জগতের জ্ঞান পর্যাপ্ত মনে করে, এবং সেই জ্ঞান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্তঃকরণকে অনুসরণ করতে চায় না।

যা হোক, আবারও আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই। আমি সচরাচর এই সংজ্ঞাটিকে বেশি পছন্দ করিঃ Thinking is linking. চিন্তা হলো দুই বা ততোধিক তথ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এখন এই সংযোগ স্থাপনের সময়ে মন একটি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং চিন্তা হলো কাজ। আমরা যেমন বাইরে শারীরিক শক্তি দক্ষতা প্রয়োগ ক'রে কাজ করি, তেমনি মনের মধ্যেও প্রধান কাজ হলো চিন্তা। চিন্তা যেহেতু একটি কাজ. সেহেতু সেই কাজের ফল রয়েছে নিশ্চয়ই। সেই ফল হলো সত্যকে চিহ্নিতকরণ। আর সত্যকে চিহ্নিত করার অভিজ্ঞতাকে আমরা যখন সঞ্চয় ক'রে রাখি, তখন তাকে বলে জ্ঞান।

কিন্তু এখানে চিন্তা আমাদেরকে কেন সত্যের মুখোমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে? - সেই প্রশ্নটি আবারও করতে হবে। তাহলে আবারও একটি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যাক। বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক

এবং মানসিক বিষয়ে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মধ্যে যেটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে তা মিথ্যা নয়। অভিজ্ঞতা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তা সত্য এবং সেই সত্য দীর্ঘদিন ধ'রে আপনার মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে ঐ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিন্দুর প্রতি ইঙ্গিত ক'রে যদি কোনো কিছু আপনার সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তা করা এবং তা বোঝা আপনার জন্য সহজ হবে। এ কারণে যারা সক্রিয়ভাবে সত্যের সাধনায় রত হয় না, অধিকাংশ রহস্য তাদের সামনে প্রকাশ করা হয় না। বরং যিনি সেই জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, তিনি চাইবেন যে জ্ঞানার্থী তার সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টায় রত হোক, এবং আবিষ্কার করুক সে কোথায় গিয়ে থেমে গেছে, এবং ফলে আর এগোতে পারছে না। সেখান থেকে যাত্রা হবে শিক্ষকের হাত ধ'রে। কারণ তখনই ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারবে যে এখন তার একজন শিক্ষক প্রয়োজন। আর তার এই অনুভূতি থেকে তার আগ্রহ, ত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি জাগবে, এবং তখনই বাইরে থেকে কোনো দীক্ষায় কাজ হবে। তা না হলে বাইরে থেকে প্রদত্ত কোনো উপদেশ সচরাচর আমাদের অন্তরে সঠিকভাবে কাজ করতে চায় না।

চিন্তা কিভাবে আমাদের অন্তরের কাছে সত্যকে বা বাস্তবতাকে তুলে ধরে সেই বিষয়টি একটু বিবেচনা করা যাক। আমাদের আধ্যাত্মিক অভিযানের পথে কয়েকটি বাধা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো - আমরা সচরাচর আমাদের মৌলিক বৃত্তিগুলি, অনুভূতিগুলি এবং মনের ক্রিয়াকাণ্ডের মৌলিক ধারাগুলি সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন করি না, অথচ তাদের সুবিধা ঠিকই ভোগ করি, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাই। চিন্তা হচ্ছে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের একটি ক্ষমতা। এই যোগ্যতা আমাদেরকে ভিতর এবং বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। ঠিক চিন্তার বিপরীতে আরও এক গুচ্ছ যোগ্যতা রয়েছে, যেগুলিকে আমরা আবেগ ব'লে থাকি - রাগ,

ভয়, আগ্রহ, বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদি। আবেগগুলি পুরোপুরি মানসিক এবং দেহ-মনের মিলিত ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রবণতা থেকে তা কিছু বিশেষ রূপ পায়। যেমন, আমি যদি কখনও আমার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না চাই, এবং সেদিকে আদৌ খেয়াল না দেই, তাহলে হয়তো বা আমার রাগ দিন দিন বাড়তে থাকবে, এবং এমন এক সময় আসবে, যখন আমি শত চেষ্টা ক'রেও আমার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। এভাবে আমাদের আবেগ-অনুভূতিগুলি জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযেগের সুযোগ ক'রে দেয়, এবং এক পর্যায়ে গিয়ে আমাদেরকে তাঁদের ওপর নির্ভরশীলও ক'রে দেয়।

তাহলে আমরা দেখছি এক দিকে রয়েছে চিন্তা আর এক দিকে রয়েছে আবেগ। চিন্তাও এক ধরণের শক্তির প্রবাহ; আবেগপুঞ্জও শক্তির প্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সচারচর আমরা যারা নিজেদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি না, তাদের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় পরিলক্ষিত হয়। তা হলো, আমরা আবেগকে এত বেশি প্রশ্রয় দেই যে সেই আবেগই আমাদের নামাজে বা অন্য ধ্যানের সময়ে চিন্তা হয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। নামাজ এমন একটি অলৌকিক, আধ্যাত্মিক আচরণ-কাঠামো এবং অনুষ্ঠান, যাতে অংশগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আবেগগুলির সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে, কারণ আমরা তখন মহা বাস্তবতার মুখোমুখি হই। আবেগগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পরেও আবেগগুলি আমাদেরকে ছাড়ে না, কারণ আমরা আবেগগুলিকে যতটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি, ততটা পরিমাণে তা আমাদের যান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয় স্বভাবের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং এভাবে চিন্তা হয়ে, দুচিন্তা হয়ে, অস্পষ্টতা হয়ে, মনের কুয়াশা, ঝাঁপসা ভাব বা চাঁদের ওপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মেঘ হয়ে, আমাদের চোখের সামনে আসে।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা আমাদের আবেগগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়ে চিন্তায় রূপান্তরিত করি, তার কারণ হলো, আমরা

কখনও আমাদের চিন্তা দিয়ে আবেগকে পর্যবেক্ষণ করি না। আমরা যদি আমাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার ক'রে ঠাণ্ডা মাথায়, মনের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি না ক'রেই, আবেগকে পর্যবেক্ষণ করতাম, তাহলে আবেগ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এক ধরণের সচেতনতা তৈরি হতো, আর ঐ সচেতনতাই হতো আমার অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কারণ। তা না করার কারণে আমাদের ক্ষেত্রে উল্টোটিই ঘটে। আমাদের আবেগই চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। বিষয়টিকে আমরা একটু অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারি এই কথা ব'লে যে, আমরা আবেগকে চিন্তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলি ফলে। আমাদের চিন্তার ঘাটতি পূরণ করে আবেগ।

আমরা চিন্তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কী ঘটে তা একটু দেখার চেষ্টা করব। সুতরাং এই মুহূর্তে আমরা আপনার মস্তিষ্ককে একটু ব্যবহার করতে চাচ্ছি। নিচে একটি সংকেত দেয়া হয়েছে, সংকেতটির মাধ্যমে একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে। ধ'রে নিন যে আপনি নিজেই কোন ব্যক্তিকে প্রশ্নটি করেছিলেন এবং আমি তা শুনেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রশ্নটিকে উপস্থাপন করেছিলেন আমি ঠিক সেভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি না একটু কৌশল অবলম্বন ক'রে সংকেতের মাধ্যমে আমি আপনার প্রশ্নটিকে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি এবং আমরা দেখতে চাচ্ছি আপনি আপনার সেই মূল প্রশ্নটিকে উদ্ধার করতে পারেন কি না?

সংকেতটি হলো: wtrukkng?

এবার তাহলে এই প্রতীকগুলির অন্তরালে যে প্রশ্নটি লুকিয়ে রয়েছে তা আবিস্কার করার চেষ্টা করুন। আপনাকে ২ মিনিট সময় দেয়া হলো। অনুগ্রহ পূর্বক কিছুক্ষণ নিজের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করুন এবং প্রতীকের অন্তরালে লুকানো সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন।

আমরা এখন উত্তর ব'লে দিচ্ছি। তবে সরাসরি উত্তর ব'লে দেব না। তার আগে আপনার অন্তরের ওপর আরেকটি পরীক্ষা আমরা করতে চাই। আপনি এই সংকেতগুলি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে চিন্তা করেছেন। হয়তো কিছু সম্ভাব্য জবাব আপনার মনে এসেছে, হয়তো বা আপনি তা পেয়ে গেছেন, হয়তো বা পাননি। কিন্তু আপনার চিন্তার ফলে আপনি যা লাভ করেছেন তা স্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট। আর যদি কিছু লাভ না ক'রে থাকেন তাহলে তো সেখানে অস্পষ্টতা সম্পূর্ণটাই বিরাজ করছে। আমরা আসলে যা উপস্থাপন করেছি, তা হলো কতগুলি প্রতীকের সমাহার। আমরা যখন চিন্তা করি, তখন সচরাচর প্রতিটি প্রতীকের অর্থকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, এবং তারপর সম্মিলিত অর্থগুলি যে বৃহত্তর অর্থ প্রদান করে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। চিন্তার এই পদ্ধতি আসলে সঠিক নয়, কারণ আমাদের মন কোনো সময়েই এভাবে চিন্তা করে না। আমাদেরকে যখন সচেতনভাবে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়, যেমন একটি ধাঁধা দেয়া হয়, বা বিপদে ফেলে দেয়া হয়, তখনই আমরা এভাবে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হই।

এখন তাহলে আপনাকে ব'লে দেই যে আপনি প্রশ্নটি যাকে করছেন তিনি রয়েছেন রান্না ঘরে। এখন তাহলে প্রতীকগুলির দিকে আর একবার তাকান এবং আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন আপনার প্রশ্নটি কী ছিল?

এতক্ষণে হয়তো আমাদের অন্তরে একটি আলো জ্বলে উঠেছে। আমরা বুঝতে পারছি যে প্রশ্নটি হলো, “What are you cooking?”

আর একটি বিষয় এখন উল্লেখ করার প্রয়োজন। আমরা যখন লিখিত কোনো টেক্সট পাঠ করি, তখন একাধিক অক্ষর-বিন্যাসের মাধ্যমে

যেভাবে শব্দ পাচ্ছি, এবং একাধিক শব্দের সমষ্টি থেকে যেভাবে একটি বাক্য পাচ্ছি, এবং একাধিক বাক্যের সমন্বয় থেকে যেভাবে একটি কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপট পাচ্ছি, সেভাবে আমরা নিচ থেকে উপরের দিক পর্যন্ত চিন্তা করতে থাকি এবং এভাবে মূল জিনিষটিকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করি। কিন্তু এই চিন্তা মনের বিচারে স্বাভাবিক নয়; মন কখনও এভাবে চিন্তা করে না। আমি যেই আপনাকে রান্না ঘরের কনটেক্সটের কথা ব'লে দিলাম, ওমনি আপনার প্রশ্নের প্রতীকগুলো সঠিক অর্থ লাভ করল। ঐ কনটেক্সট থেকে আপনার প্রতীকগুলো তাদের অর্থ সংগ্রহ করল। আমাদের মনে যখনই একটি কনটেক্সট জেগে ওঠে, তখন ঐ ভাষাতাত্ত্বিক উপস্থাপনটিও আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে। কারণ আমরা সচরাচর ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করি এবং ভাষাবিহীন চিন্তার সাথে আমরা সচরাচর পরিচিত নই। তা একেবারেই একটি আধ্যাত্মিক চিন্তা। অন্য কোনো বইতে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। আমাদের এই ভাষা-নির্ভর চিন্তার একটি সুফল হলো এই যে, আমরা যখনই কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তখনই সেই বিষয়কে বর্ণনা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গোত্রের শব্দ (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ ক্রিয়াপদ ইত্যাদি) মনের মধ্যে সুসজ্জিত হয়ে যায়। এবং তার মধ্যে বাহুল্যপূর্ণ কোনো শব্দ থাকে না, কারণ শুধু ঐ কনটেক্সটের সাথে সংযুক্ত শব্দগুলোই আমাদের মনে এসে সক্রিয় হয়। অন্য কোনো শব্দ সেখানে এসে স্থান গাড়ে না। ফলে আমরা ঐ ক্ষুদ্র কনটেক্সট থেকে উদ্ভূত মনের ভাষা-বিন্যাসের দিকে তাকিয়েই প্রতিটি শব্দের অর্থ উপলব্ধি করতে পারি।

অর্থাৎ অর্থ আসে কনটেক্সট থেকে, প্রতীক থেকে নয়। কিন্তু আমরা অর্থকে খুঁজি প্রতীকের সীমানায়। এটাই হলো আমাদের ত্রুটি।

এখন আমরা আমাদের চিন্তার প্রসংঙ্গে ফিরে যাই। আপনি প্রতীকগুলোকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে চিন্তা করেছেন। যদি মূল

প্রশ্নটিকে উদ্ঘাটন করতে পেরে থাকেন, তো ভালো কথা, কিন্তু সেক্ষেত্রেও আপনার সময় লেগেছে, এবং যদি মূল প্রশ্নটিকে উদ্ঘাটন করতে না পেরে থাকেন, তাহলে তো আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে চিন্তাটা কত দূরূহ ছিল। কিন্তু যেই আমরা কনটেক্সটির কথা ব'লে দিলাম, ওমনি আপনার মনের মধ্যে প্রতীকগুলি অর্থ পেয়ে গেল। এমনও হতে পারে যে কনটেক্সট ব'লে দেয়ার পরও আপনার মনে অর্থগুলি স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু কনটেক্সট ব'লে দেয়ার পর আমি যখন মূল প্রশ্নটিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ক'রে দিলাম, তখন কিন্তু ঠিকই আপনার মনে একটি আলো জ্ব'লে উঠলো, এবং ফলে আপনার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আমি প্রশ্নটিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছি, পর্যাপ্ত সময় পেলে ঠিক আপনি তাকে ওভাবেই আবিষ্কার করতেন।

এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতীকের সীমানায় আমরা অর্থকে অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন প্রতীকের গুচ্ছকেও যখন বিবেচনা করি, তখন আমাদের চিন্তাগুলি প্রতিটি প্রতীকের আশ্রয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে সংঘঠিত হয়, এবং আমাদের চিন্তা কোনো সার্বিক কাঠামো লাভ করতে পারে না। আমাদের চিন্তার মধ্যে ঐক্য থাকে না। এ কারণে সে অর্থ বুঝতে আমাদের সমস্যা হয়, যদিও সে অর্থ আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি, তবুও সে উদ্ঘাটনের আগেই এত বেশি সময় ব্যয়িত হয়ে যায় যে, সে উদ্ঘাটন আমাদের আর কোনো কাজে লাগে না।

তাহলে আমরা আবিষ্কার করলাম যে, আমরা আসলে চিন্তা করি কনটেক্সটকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। যখন কনটেক্সটকে খুঁজে পাই তখন আমাদের আর চিন্তার প্রয়োজন হয় না। কারণ ততক্ষণে আমাদের মনের মধ্যে সত্যের ভাষা-নির্ভর চিত্রটি ভেসে উঠেছে।

সচরাচর আমরা যেভাবে চিন্তা করি তার সাথে কনটেক্সটের সচেতনতা জড়িত থাকে না ব'লে আমরা শুধু চিন্তাই করতে থাকি, এবং অনেক

সময়ে কোনো সিদ্ধান্তে বা সমাধানে পৌঁছাতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়ে সচেতন থাকি যে, চিন্তা করার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, বরং চিন্তা করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক কনটেক্সটকে নিজের মনের চোখের সামনে তুলে ধরা সম্ভব, এবং এই তুলে ধরার কাজটি সম্পন্ন হলে তারপর চিন্তার আর কোনো প্রয়োজন নেই, সেখানে ঘটে শুধু দেখা - সে আপনি চোখ দিয়ে দেখেন, বা নাক দিয়ে দেখেন, বা মুখ দিয়ে দেখেন, সেটা ভিন্ন কথা। আমরা যখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যবহার ক'রে কোনো তথ্য গ্রহণ করি, তখন আমরা আসলে কোনো না কোনো অর্থে দেখি। আর মূল দ্রষ্টা হলো আমাদের মন। চোখ আসলে দেখে না, দেখে মন, যে কারণে অন্যমনস্ক অবস্থায় আমরা যখন কোনো দিকে তাকাই, আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছুই ভাসে, কিন্তু সে দেখা সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না ব'লেই আমরা ব'সে থাকি যে আমি তা দেখিনি, অথচ দেখা বলতে যদি চোখের দেখাকে বুঝানো হয়, তাহলে আমি তা দেখেছি। সুতরাং আমাদেরকে বলতেই হবে যে, আমরা চিন্তার মেঘের কারণে সত্যকে দেখতে পাই না। আমরা যদি চিন্তাকে বাদ দেয়ার অভ্যাসটি গ'ড়ে তুলি, তাহলে কিন্তু চিন্তার মেঘ আমদের অন্তরের মধ্যে লুকায়িত চাঁদের ওপর আবরণ ফেলতে পারবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে: চিন্তাকে বাদ দিলে তো বোকা হয়ে যাব। এবং তা কি জীবিত অবস্থায় সম্ভব? - আসলে যেখানে চিন্তার প্রয়োজন নেই আমরা সেখানে চিন্তা করি ব'লেই ঝামেলাটি ঘটে। আপনি যখন রেগে যান তখন যদি রাগ কাকে বলে কত প্রকার ও কী কী তা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করেন, তাহলে কিন্তু চিন্তার দাবি আদায় হতো।

মনের মূর্তি

আমরা একটু আগে জেনেছি যে মনের সক্রিয় কার্যক্রম দুই ধরনের - চিন্তা এবং আবেগ। কিন্তু এই চিন্তা এবং আবেগ ছাড়াও মনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম রয়েছে, তা হলো এটিটিউড বা দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টিভঙ্গি হলো মনের বিশেষ অভিমুখিতা, যা দ্বারা সে কিছু জিনিষকে বেছে নেয়, কিছু জিনিষকে বর্জন করে, কিছু জিনিষকে পছন্দ করে, কিছু জিনিষকে অপছন্দ করে। আর এ কারণে কোনো কিছু বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তা না হলে এই কাজটি সম্ভব হতো না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি এমন কোনো ত্রুটি থাকে যা সত্যের সঙ্গে সহাবস্থানপূর্ণ নয়, তাহলে আমাদের চিন্তা এবং অনুভূতি তথা আবেগ কিছু পরিমাণ হলেও ভুল পথে ব্যয়িত হয়ে যায়, তবে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। ঐ ব্যবহৃত আবেগ বিশেষ অভ্যাসে রূপান্তিত হয়ে আমাদের মধ্যে যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে, এবং আমরা তার বিরোধিতা করলেও বার বার তা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, নিজের যোগ্যতায়ই বেঁচে থাকে। এভাবে মনের শক্তি, যোগ্যতা বা প্রবণতা থেকে কিছু ফলশ্রুতির উদ্ভব ঘটে, যা আমাদের মনকে একটি বিশেষ অবস্থানে রেখে দেয়। এই অবস্থার একটি নাম হলো মনের মূর্তি। কন্‌ডিশনিং। মনের জড়তাপূর্ণ অভ্যাস। ইব্রাহীম (আ.) যখন

কুড়াল দিয়ে আঘাত ক'রে তার বাবার তৈরি করা মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেছিলেন, তখন তিনি বাহ্যিক অর্থে তা করেছিলেন, এবং তার রূপক অর্থে যে সত্যটিকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা হলো এই যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই যে দেহ, এটিই মূর্তি - এই দেহ সম্পর্কে আমার যে ধারণা, সে ধারণাও মূর্তি, মূলত সেই ধারণাই আসল মূর্তি - সে ধারণাকে ভেঙ্গে না ফেলা পর্যন্ত সত্যকে জানা যাবে না।

ইসলাম ধর্মের কোথাও খুব বেশি জোর দিয়ে বলা হয়নি যে আল্লাহ নিরাকার, কিন্তু হিন্দু ধর্মে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা সাকার এবং নিরাকারকে চিহ্নিত ক'রে তারপর নিরাকারকেই উপাসনার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। অনেকে সেই নিরাকারকে উপাসনা করার উপলক্ষ্য হিসাবে সাকারকে গ্রহণ করেন। হয়তো দার্শনিক বিচারে তাদের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং হয়তো অনেক ব্যাখ্যাই সঠিক, কিন্তু যতই ব্যাখ্যা দেয়া হোক না কেন, মূর্তি থেকে কোনো রেহাই নেই। আমি যখনই নিরাকার সম্পর্কে কিছু ভাবব, তখনই সে বিষয়েও আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে চাইব, এবং আমার মনের মূর্তি থেকে আমি বের হতে পারব না, কারণ আমরা নিরাকার ব'লে যা বুঝি, তাও আমাদের ধারণা মাত্র। ধারণা থেকে আমি বের হতে পারব না ব'লে, এবং আমার অনুভূতির মাধ্যমে বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারব না ব'লে, এক সময়ে আমার চিন্তা থেমে যাবে। আল্লাহকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না - এই কথাগুলো ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য, তবে এগুলি প্রধান কথা নয়, কারণ আল্লহ বলেছেন যে তিনি জাহের, তিনি বাতেন - তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন। সুতরাং তাঁকে দেখা যাবে না, তার কোনো আকার নেই, শুধু এ কথাটি বলা যেমন ঠিক নয়, তেমনি তাকে দেখা যাবে, তাঁর আকার আছে, শুধু এ কথাটি বলাও ঠিক নয়। যেই মুহূর্তে তাঁকে আমি জাহের হিসেবে চিহ্নিত

করছি, ঐ মুহূর্তে আমার অন্তর বাতেনকে দেখতে ব্যর্থ হচ্ছে ব'লে আমি জাহের হিসেবে তাঁকে পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করার যোগ্যতা হারাচ্ছি। কারণ বাতেনকে না দেখে জাহেরকে চিহ্নিত করা মানে সেই মূর্তিকেই চিহ্নিত করা।

এখন আমাদের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয় হলো মনের এই মূর্তি। এর রহস্য কী? একটি উদাহরণ থেকে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি। ধরা যাক আমার স্ত্রী আমার সংঙ্গে খুব খারাপ আচারণ করেন। কোনো একটি বা দু'টি বা দুই পাঁচ বছরের আচরণ থেকে তার সম্পর্কে আমার একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ফলে তার সঙ্গে আমার অন্তরের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো দুই দিন বা পাঁচ দিন পর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে তার সম্পর্কে আগে যে ধারণাটি বর্ধমূল ছিল, সেই ধারণাকেই আমি দেখবো। নতুন ক'রে তাকে দেখার সুযোগ আমার হবে না। এক বা দুই দিনের মধ্যে তিনি যে পাল্টে অন্য কেউ হয়ে গেছেন, সে দিকেও হয়তো আমার কোনো খেয়াল যাবে না।

এই হলো আমাদের মনের মূর্তি। কেউ আমাদেরকে একটু কষ্ট দিয়ে ফেললে তার সম্পর্কে আমাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় এবং আমাদের অন্তরে একটি অনুভূতি সঞ্চিত হয়। পরবর্তিতে তার মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরের সেই অনুভূতি সামনে এসে হাজির হয় এবং সেই অনুভূতির চশমার মধ্য দিয়ে আমরা তার দিকে তাকাই। ফলে আমরা কোনো দিন কোনো বর্তমানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে দেখতে পাই না। বরং আমরা তাকে দেখি তার বা আমার নিজের অতীতের মধ্যে। অর্থাৎ আমাদেরই স্মৃতির মধ্যে। আমাদের এই জাতীয় দেখা মিথ্যা। এই হলো মনের মূর্তি।

কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের যদি কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত না হতো, তাহলে মনের মূর্তিও গঠিত হতো না। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অনুভূতির মধ্যে যা কিছুই সঞ্চিত থাকত, সেই সঞ্চয়কে বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যবহার করার ইচ্ছা জাগত না। প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি একটি শক্তি এবং একটি আবশ্যিকতা। দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে কোনো রেহাই নেই। হয় সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক করতে হবে, না হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিথ্যার পক্ষে চ'লে যাবে। দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে যে কোনো রেহাই নেই - এই মূল কথাটি জানাই হলো অন্তরের সঠিক ধর্মকে উপলব্ধি করা। অন্তরের একটি ধর্ম আছে। কোনো বিশেষ ধর্মের ছায়াতলে না গিয়েও সেই ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এবং সেই ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পরেই যদি আমরা কোন বিশেষ ধর্মশাস্ত্রের অধীনে যাই, তখন তার সত্যতা মিথ্যাত্ব সব ধরা পড়বে এবং আমরা হয়তো তখন পথ পাবো। কিন্তু এইভাবে যদি আমরা কামনা করি যে, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার পরেই তার অন্তরে সত্যের উপলব্ধি জন্মাবে, সুতরাং তাকে জোর ক'রে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানো হোক, তাহলে আমাদের সেই চিন্তা হবে নিছক ভ্রান্তি। আল্লাহ বলেছেন যে আমরা অনেক সময়ে নৌকাতে আহরণ করি এবং নদী পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করি। মাঝ পথে অনেক সময়ে ঝড় ওঠে, তখন আমরা মনে-প্রাণে আল্লাহকে ডাকি। আমাদের ধর্মকে তার জন্য তুলে ধরি। তার পর আল্লাহ তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং আমরা কূলে চ'লে আসি। এক পর্যায়ে আল্লাহর দয়ার দান আমরা ভুলে যাই। আবারও কুফরি বা শিরকি করা শুরু করি। নিচে তাহলে আয়াতগুলি দেখা যাক:

তারপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপন্মুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দৌরাত্মে লিপ্ত হয়। হে মানুষ! তোমাদের দৌরাত্ম্য তো তোমাদের নিজেদের ওপরই। পার্থিব

জীবনের সুখভোগ করে নাও, পরে আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।

(সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৩)

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যাতে ক'রে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন? প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। যখন ঢেউ চাঁদোয়ার মতো তাদেরকে ঢেকে ফেলে, তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে, (তাদের) ধর্মকে তাঁর জন্য বিশুদ্ধ করে; কিন্তু যখন তিনি তাদের কূলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন তখন তাদের কেউ-কেউ মাঝপথ দিয়ে চলতে থাকে। আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউ তো তাঁর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে না।

(সূরা লুকমান, আয়াত: ৩১-৩২)

এখানে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে 'ধর্ম' শব্দটির প্রতি। আমরা মনে করি নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কাঠামোর মধ্যে সঠিক আচরণ করলেই আমরা ধর্মের অনুসারী হই। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন - তাদের ধর্মকে তারা আমার কাছে উৎসর্গ করে। এ থেকে তিনি ধর্মকে দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, মনের গভীর মনোযোগ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এবং সেই মনোযোগকে কেউ যখন আল্লাহর দিকে সমর্পণ করে, তখনই সেই মনোযোগ তার সঠিক জায়গায় চ'লে যায়, মনোযোগের সঠিক হক আদায় হয়। তা না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর যত দিকেই মনোযোগ সমর্পণ করি না কেন, তা আমাদের মনকে পরাধীন ক'রে দেয়, এবং তার চিন্তা থেকে আমারা আমাদের মনকে স্বাধীন করতে পারি না। ফলে আমরা মনের শক্তি এবং স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলি।

মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোকে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝা যায় আমি সঠিক দিকে আমার ধর্মকে উৎসর্গ করেছি, না কি বেঠিক দিকে। ধর্ম থেকে কোনো রেহাই নেই। আল্লাহ্ বলেছেন লাকুম দীনুকুম আল্য়াদীই - তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। অর্থাৎ যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে না - কোনো ধর্মই নেই, আমার একারই ধর্ম আছে। বরং বলা হচ্ছে - তোমারও ধর্ম আছে। এবং আমারও ধর্ম আছে তোমারটা তোমার, আমারটা আমার। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ধর্ম থেকে কোনো রেহাই নেই। ধর্ম মানুষের থাকতেই হবে। হয় আমি ইবলিসকে আমার ধর্মের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ণয় করব, না হয় আল্লাহকে। হয় সত্যকে, না হয় মিথ্যাকে। কিন্তু ধর্মবোধের হাত থেকে আমার কোনো রেহাই নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারেঃ যারা ধর্ম-কর্মে আদৌ বিশ্বাস করে না, কোনো বিশেষ ধর্মের ছায়াতলে যাওয়াকে পছন্দ করে না, অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে নাস্তিক ব'লে পরিচয় দেয়, তাদের ব্যাপারে কী বলতে হবে? তাদের ব্যাপারে আমাদের কথা হলো, তারাও একটি ধর্মকে অবলম্বন ক'রে আছেন - নাস্তিকতাকেই ধর্মের মতো মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। এবং নাস্তিকতা যদি ভিত্তিপ্রস্তর-বিহীন নিছক বাগাড়ম্বরও হয়ে থাকে, এবং তার পরেও ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে অনুসন্ধিৎসু হয়, তাহলে সে তার মধ্যেই একটি ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবে, নিজের অজান্তেই হোক, আর স্বজ্ঞানে হোক। যেমন আমরা কাল মার্কসের কথা বলতে পারি। তিনি দার্শনিক এবং অর্থনৈতিক মতবাদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র চালাবার একটি মতবাদ দিয়েছিলেন। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করা - বিশেষ ক'রে অর্থনৈতিকভাবে। কেন একজনের ওপর আর একজন বিজয়ী হবে? কেন সবাই সমান অধিকার পাবে না? তার লক্ষ্য ছিল সে বিষয়টিকে প্রশ্নের সম্মুখীন ক'রে সমাজে এক ধরণের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। সে

ব্যাপারে তিনি সারা পৃথিবীতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটাতেও সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন ক'রে এমনভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন, যা ইহকাল পরকাল সব কিছু মিলে মানুষের জীবনের ধারাবাহিকতাকে বিবেচনা না ক'রে মানুষকে শুধু ইহকালের সংকীর্ণ পটভূমিতে বিচার করল। তিনি বললেন - ধর্ম সত্য নয়। তার কথা অনুযায়ী লেলিন বললেন যে যৌবন হলো এক গ্লাস শরবতের মতো। এবং ঐ সময়কার রুশ সাহিত্য থেকে আমারা জানতে পারি যে, তারা এই দৃষ্টিভতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, একজনের স্ত্রী আর একজনের সঙ্গে রাত যাপন করলেও তাতে কোনো নৈতিক অপরাধ নেই। তারা নৈতিকতার সব বাধ ভেঙ্গে মানুষকে শুধু জাগতিক অর্থে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ এমন এক জীব, শুধু জাগতিক মুক্তিই যাকে আরও বন্ধনের মধ্যে আটকাবে আর সংকীর্ণ ক'রে দেবে, সঠিক মুক্তি দিতে পারবে না। এটা তারা বুঝতে পারেননি। তাই পরবর্তীতে কমিউনিজম এর বিভিন্ন প্রবক্তা এবং গবেষকগণ তার মধ্যে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করার জন্য কালচার বা কৃষ্টিপ্রীতি প্রবর্তণ করেছিলেন, এবং এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিকগণ যখন ধর্মের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠেন, তখন তাদের বিশ্বাসের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়েই তারা কৃষ্টিচর্চা, নাচ, গান, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনবোধ জাগিয়ে তোলা ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। এবং তাদের এই গুরুত্বের ধরন দেখলেই বোঝা যায় যে ধর্মের অবর্তমানে ধর্মের প্রতি তাদের অন্তরে যে তৃষ্ণা রয়েছে তারা সেই তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন এই উপায়ে। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে ধর্মের হাত থেকে কোনো রেহাই নেই।

এখন আমাদের পর্যবেক্ষণটি আর একটু সূক্ষ্ম পর্যায়ে পৌছবে। আমাদের মনের মধ্যে কোনো না কোনো অভিমুখিতা বা ধর্ম গঠিত হয়। এই সঞ্চিত অভিমুখিতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা যদি সঠিক দিকে

পরিচালিত করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আল্লাহ ধর্ম ব'লে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন, এবং আমাদের অন্তরে ধর্ম ব'লে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অভিজ্ঞতার পথ দিয়েই যে বিষয়টি চিহ্নিত হয়ে আছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে সূরা রুম এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি তাঁরই স্বভাব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর স্বভাবই হলো মানুষের আসল ধর্ম। এই ধর্মে কোনো পরিবর্তন নেই। সুতরাং মানুষের উচিত সেই স্বভাব ধর্ম অনুসরণ করা।

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। তুমি আল্লাহ প্রকৃতির অনসরণ করো, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

(সূরা রুম, আয়াত: ৩০)

এখানে কিন্তু ধর্ম হিসেবে নামাজ, রোযা এ সবকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। এগুলি হলো ধর্মের কাঠামো, ধর্মের ভিত। এগুলো টিকে না থাকলে অন্তরের এই ধর্ম - যা কোনো কোরআন হাদিস বা বেদ-বাইবেল এগুলির সাহায্য ছাড়াও অন্তরে আগে থেকেই রয়েছে, কারণ আল্লাহ আমাদের মধ্যে তা দিয়েই দিয়েছেন - তা এক পর্যায়ে গিয়ে টিকে থাকবে না, এবং একটি বিশেষ কাঠামোর ছায়াতলে এসে বিশ্রাম নেয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। এ কারণে কোনো ধর্মীয় অচরণকে ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই, এবং যা ধর্মীয় আচরণ নয় তাকে ধর্মীয় আচরণ হিসেবে ঘোষণা করা, অর্থাৎ বিদআতকে প্রচলিত করার অধিকারও কারও নেই। ধর্ম ধর্মের জায়গাতেই থাকবে। আমাদের অন্তরকে বরং ধর্মের জায়গায় নিয়ে ফেলতে হবে। প্রথমত অন্তরের মধ্যে ধর্ম খুঁজতে হবে। এবং সেই

খোঁজা যখন সফল হয়ে যাবে, তখন বাইরের সত্য ধর্ম আমাকে এমনিতেই আকর্ষণ করবে।

আমরা অনেকে মনে ক'রে ফেলি যে কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলে হয়তো আমরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবো। কিন্তু কোরআনে বলা হয়েছে তার উল্টো কথা। আল্লাহ বলেছেন - এই কোরআন নিয়ে যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন তারা যদি বিশ্বাসী হন তবে তাদের বিশ্বাস আরও বাড়তে থাকে, জ্ঞান বাড়তে থাকে। সত্যকে নিয়ে চিন্তা করলে বা প্রশ্ন করলে তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে? আমরা যদি ভেবে বসি যে আমার চিন্তা এবং প্রশ্নের কারণেই সত্য মিথ্যাতে রূপান্তিত হয়ে যাবে, তাহলে আমি সত্যকেই ছোট ক'রে দেখলাম। কেবল অসুস্থ অন্তরই সত্যকে এত ছোট ক'রে দেখার সাহস করে। এটুকু আত্মবিশ্বাস অন্তরে থাকতেই হবে, যা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারব যে, আমি যতভাবেই বিচার বিশ্লেষণ করি না কেন, আমার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, আমি অবশ্যই সত্যকে পাবো, এবং সেই সত্য আর কোরআনের সত্য যদি এক হয়, তবে অবশ্যই কোরআর আমাকে আকৃষ্ট করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণে আমরা দেখি যে, আল্লাহ বার বার রসূল (স.) বলছেন - তুমি জবরদস্তির কথা ভেবো না; অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস করছে দেখে তুমি দুঃখ পেয়ো না, তা নিয়ে বেশি চিন্তা ক'রে নিজেকে নিঃশেষ করো না; ইত্যাদি।

> *তা-সিন-মিম! এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, ওরা বিশ্বাস করে না ব'লে তুমি হয়তো মনের দুঃখে নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে।*
>
> *(সূরা শোআরা, আয়াত: ১-৩)*
>
> *তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার ওপর কোরআন অবতীর্ণ করি নি।*
>
> *(সূরা তাহা, আয়াত: ২)*

ওরা বিশ্বাস করে না ব'লে তুমি হয়তো মনের দুঃখে নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে ওদের কাছে এক নির্দশন পাঠাতে পারি, যার কাছে ওরা লুটিয়ে পড়বে।

(সূরা শোআরা, আয়াত: ৩-৪)

এবং তার সঙ্গে তিনি এও বলতে দ্বিধা করছেন না - আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে ঈমান দেন যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহিতে ফেলে দেন। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তারা কখনোই ঈমান আনবে না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এও বলছেন - তারা কখনোই ঈমান আনবে না। আল্লাহর এই জাতীয় উক্তি থেকে আমরা একটি চমৎকার সত্যকে উদ্ঘাটন করতে পারি: কোনো মানুষ যদি কোরআন রচনা করতো, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে বলার জন্য সে এমন কিছু কথা বলতো যার ফলে কখনও আল্লাহর ঘাড়ে যেন দোষ না যায় এটাই সে নিশ্চিত করতে চাইতো। অর্থাৎ কোনো মানুষ যখন তার নিজের জন্য বা তার মান-সম্মান, ব্যক্তিত্ব, প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য নিজে একটি সত্যকে উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে, তখন সেই সত্যকে নির্ভেজাল রাখার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ যদি কোনো মানুষের উদ্ভাবিত আল্লাহ্ হতেন, নকল কোনো চিন্তা এবং কল্পনা হতেন, অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে বলার ভান ক'রে কোনো মানুষ নিজেই যদি কথাগুলি বলতো, তাহলে সে কথাগুলিকে এমনভাবে বলতো, যেন সব সময়ে আল্লাহ্ মহান হয়েই থাকেন, তার সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ না জাগে - ফলে আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে যে মিথ্যা উপস্থাপন করলাম, সে মিথ্যাকে সবাই শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে। কিন্তু আল্লাহ্ এখানে স্পষ্ট ক'রে শত শত বার কোরআনে বলছেন যে তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। অবিশ্বাসীরা তো আল্লাহর ওপর দোষ চাপায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যাদের মাঝে মাঝে বিশ্বাস ক'মে যায়, তারাও কিন্তু আল্লাহর ওপর মাঝে মাঝে দোষ

চাপাই, এবং এই প্রশ্নও করি যে, তিনি চোরকে চুরি করতে বলেছেন, সুতরাং চোর যদি চুরি করে, তো মানুষের কি দোষ? আমরা আল্লাহকে দোষ দেই। আল্লাহ কিন্তু নিজের ঘাড় থেকে দোষ ঠেলে ফেলে না দিয়েই নিজেও একই কায়দায় নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে ফেলেন এবং স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন, যাকে ইচ্ছা অবিশ্বাসের মধ্যে হতাশ অবস্থায় ছেড়ে দেন। অর্থাৎ তিনি সবকিছু তাঁর ইচ্ছা দিয়েই করছেন এবং তা বলতেও তিনি দ্বিধা করছেন না, তাঁকে কেউ দোষ দেবে কি না দেবে, সে বিষয়েও চিন্তা করছেন না। এই ভাবে যদি কোরআনে কথা বলা না হতো, তাহলে আমাদের সন্দেহ থাকতো যে এই কোরআন মানুষের বাণী না কি সঠিক আল্লাহর বাণী। যেহেতু আল্লাহ সত্য বলতে দ্বিধা করেন না এবং যেহেতু তার রহস্য আমরা পুরোপুরি কখনোই জানতে পারব না, সেহেতু তিনি ঠিক সত্যের পূর্ণাঙ্গ স্তর থেকেই কথা বলেছেন, সেই কথার কোন অর্থ কার কাছে কোনো তাৎপর্য বহন করবে তা নিয়ে তাঁর ভাষার প্রয়োজন নেই, তা সত্যকে প্রকাশের কোনো উপায়ও হতে পারে না। সত্য প্রকাশ মানে যা সত্য তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করা।

যা হোক, আমরা মূল আলোচনায় আবার ফেরত যাই। আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের অন্তরে যে ধর্মবোধ সৃষ্টি হয়, সেই ধর্মবোধ অনুযায়ী আমাদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদির শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি সবকিছুই সুসজ্জিত হয়ে যায় এবং তারাই আমাদের অন্তরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে ঐ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। এই ধর্মবোধই আসলে মূর্তি, যদি এই ধর্মবোধ সত্যের অনুগামী হয়, তাহলে মূর্তি ধ্বংস হয়ে যায়। তখন প্রমাণিত হয় যে সেই ধর্মবোধই সত্য। আর যদি আমাদের অন্তরের এই ধর্মবোধ সত্যের অনুগামী না হয়, বরং আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুগামী হয়, তাহলে তা আমাদের মধ্যে

মূর্তির সৃষ্টি করে, যে জন্য আল্লাহ্ বলেছেন - তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তার উপাস্য হিসেবে বেছে নিয়েছে?

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম।

(সূরা ফোরকান, আয়াত: ৪৩-৪৪)

আশা-আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করছে, অর্থাৎ তারা ধর্মকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে মেলে ধরেছে। ধর্মবোধটিকে আশা-আকাঙ্ক্ষার সাময়িক শক্তি দিয়ে তরতাজা ক'রে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথার অবতারণা করতে পারি: পৃথিবীতে যত মিথ্যা আছে, সবই শক্তিহীন। আল্লাহ্ বলেছেন - তিনি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানেন এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার পরও আমরা মিথ্যাকে বেশি বেশি শক্তিশালী হিসেবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমরা অনুমান করতে পারছি যে, দিন দিন মিথ্যা আরও শক্তিশালী হবে। কারণ কী? কারণটা খুবই সোজা। মিথ্যার কোনো শক্তি নেই। মিথ্যাকে শক্তিশালী করতে হলে সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করতে হয়, এবং সত্যের শক্তিটিকে ব্যবহার করেই মিথ্যাকে সত্য হিসেবে চালু রাখতে হয়। এ জন্য আল্লাহ্ বলেছেন - তোমরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশ্রিত করো না; জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। এই দুইটি বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরি। এই দু'টি বিষয়ের আলোচনার সাথে কোরআন, হাদিস, ধর্ম, বেদ, বাইবেল, পূরাণ এই সবের কোনো ইঙ্গিত নেই। এই দুইটি বিষয় ধর্মকে অবলম্বন করার আগেও আমাদের অন্তরে আসতে পারে, এবং ধর্মকে অবলম্বন করার পরেও। আমরা যেন বাপ–দাদার ধর্মে স্থাপিত হয়েছি এই বিচারে ধার্মিক না হই, বরং সত্যকে খুঁজে পেয়েছি এই বিচারে ধার্মিক হই, সেই জন্যে আল্লাহ এই কথাগুলি কোরআনে রেখে

দিয়েছেন, যেন আমরা সত্যকে খুঁজে পাই, এবং আমাদের অন্তরের ধর্ম এবং কোরআনের বর্ণিত ধর্মের একত্ব অনুভব করি, এবং তাদের মধ্যে যে আদৌ কোনো পার্থক্য নেই, তা উপলব্ধি করি।

মনের মূর্তিকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমরা সেই মন দিয়ে কখনও সত্যের তথ্যকে আহরণ করতে পারব না বা সত্যের তত্ত্বকে ধারণ করতে পারব না। এই মূর্তি ভাঙ্গার প্রচেষ্টা হিসেবে মনের কিছু সচেতনতাকে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। যেমন, আমি যখনই আমার মনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, অবস্থা ইত্যাদির সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত টানছি, তখনই লক্ষ করতে হবে যে, আমার কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত এবং সংকীর্ণ পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে কি আমি সেই সিদ্ধান্ত টানছি, না কি আমার বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার সিদ্ধান্তটি আমি গ্রহণ করছি? যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে আমরা বিবেককে ব্যবহার করি। সুতরাং মনের শক্তিগুলিকে ব্যবহার করার সময়ে মনের ব্যাকগ্রাউন্ডের মূল সচেতনতা দিয়ে সেই মনের কার্যক্রমগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যেন আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের মনের মাঝে ভূল মূর্তি গঠন না ক'রে ফেলে। মনের মধ্যে যত ভুল মূর্তি ইতিমধ্যে সংগঠিত হয়ে গেছে, তা থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়? এই প্রশ্নটিও করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আমরা দুইটি পথ অবলম্বন করতে পারি: আমরা মনের সে মূর্তিকে নতুন জ্ঞানের সে আলোকে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে পারি। আমি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ বা স্পিরিচুয়াল অ্যানালাইসিস নামে একটি বিশেষ বিশ্লেষণের প্রবর্তন করতে খুব আগ্রহী। এই কারণে যে, এই বিশ্লেষণই আমাদেরকে কোনো ধর্মের প্লাটফর্ম ছাড়াই প্রথমে আমাদেরকে ধর্ম দান করে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই ধর্মকে গ্রহণ করে - স্বেচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক। যখন আমার সত্যকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমরা নিজেদেরকে

সৌভাগ্যবান অনুভব করি; আর আমরা যখন ধর্ম হিসেবে মিথ্যাকে গ্রহণ করি, তখন আমরা যে সত্য ত্যাগ করেছি, এই অনুভূতি প্রথম প্রথম আমাদের মনে জাগে, তবে এক পর্যায়ে গিয়ে তা আর থাকে না। এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঁকি দেয়া অনুভূতিই আমাদের বিবেক। ইংরেজিতে কনশেন্স, কিন্তু মূলত এটিই কমোন সেন্স। বিবেককে জাগ্রত ক'রে মনকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করার সময়ে আমরা যদি মনকে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমাদের মনে কোনো মূর্তি গঠন হবে না। এবং মনে একবার মূর্তি গঠিত হয়ে গেলে তার রহস্য জানার মাধ্যমে সেই মূর্তির আকর্ষণীয় ক্ষমতা থেকে আমারা রেহাই পাবো। এবং অন্যদিকে এই কাজটিও করা সম্ভব যে, আমার মনের মধ্যে আদৌ কোনো মূর্তি গঠিত হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার চরিত্র কেমন, সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করব না। ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা মনকে বিশেষ অভিমুখিতা দান করব। আর এভাবেই আমরা আমাদের মনকে মূর্তি-মুক্ত ক'রে ফেলতে পারব। আর মন যখন মূর্তি মুক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর সীমিত থাকে না, অসীমের সঙ্গে মিশে যায়। তখন তাকে আর কোনো জ্ঞান অর্জন করতে হয় না, সে নিজেই জ্ঞানে রূপান্তিত হয়ে যায়। তখন জ্ঞান আর স্বভাবের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। জ্ঞানই স্বভাবে রূপান্তরিত হয়। স্বভাবই জ্ঞানকে প্রকাশ করে। মনের মূর্তি হলো আমাদের পরাধীনতার প্রধান কারণ। সুতরাং উভয় উপায় ব্যবহার ক'রেই আমাদেরকে মনের মূর্তি গঠন থেকে মনকে রক্ষা করতে হবে।

আসুন আর একটি চমৎকার উদাহরণ বিবেচনা করা যাক ধরুন আপনি কাজ–কর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন। খুব বেশি বিশ্রাম পান না। ফলে ছয় মাস বা এক বছর বা পাঁচ বছর পরে আপনি দূরে কোথাও বেড়াতে যান। ধরা যাক এবার আপনি শ্রীমঙ্গলে গেলেন। শ্রীমঙ্গলে গিয়ে আপনি যে পাহাড়ী দৃশ্য দেখবেন - পাহাড়ের মাথার ওপর মেঘ

কিভাবে *ঠেস* দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গাছপালার সবুজের সমারোহ কিভাবে চোখকে শীতল ক'রে দিচ্ছে, ঝর্ণার প্রবাহ অন্তরের মধ্যে একটি বিশেষ আনন্দের প্রবাহকে উস্কে দিচ্ছে - এই সবকিছু দেখে আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। আর তখনই আপনি আনন্দ পাবেন।

আমরা একটি চমৎকার জিনিষ এখানে ধরতে পেরেছি - আপনি বিস্মিত হবেন। ***বিস্মিত*** হওয়া মানে কী? আমরা সচরাচর ভেবে দেখি না বিস্মিত হওয়া বলতে আমরা কী বোঝাই। বিস্মিত হওয়া মানে মনের মধ্যে কোনো আবেগ জেগে ওঠা নয়। বিস্মিত হওয়া মানে চিন্তা-মুক্ত হয়ে যাওয়া। চিন্তা-মুক্ত হওয়ার মানে হচ্ছে আমি যা দেখছি এবং যে দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, এই দুইয়ের মধ্যে চিন্তার ব্যবধান নেই। আমাকে কোনো কিছু দেখার পরেও তা নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না। বরং চিন্তা করার আগেই তার সৌন্দর্য আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করছে, ফলে আমরা মুহূর্তের মধ্যে চিন্তামুক্ত হয়ে যাচ্ছি, আর এতেই আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হচ্ছি।

অর্থাৎ আমাদের চিন্তাই আমাদের মূর্তি। নতুন কোনো দৃশ্য দেখার সময়ে আমরা এই মূর্তির মধ্য দিয়ে দেখি না, বা আমাদের এই মানসিক মূর্তির গঠন অনুযায়ী দেখা বা তথ্য গ্রহণের রীতি নির্ধারিত হয় না। তার কারণ হলো, যা কিছু আমি আগে কখনও দেখিনি, তা যেহেতু নতুন, সেহেতু তার সম্পর্কে আগে থেকে আমার মনের মধ্যে কোনো ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকেনি। এ কারণে আমি কোনোরূপ ধারণা ছাড়াই তা দেখতে পেরেছি। অর্থাৎ আমি সত্যকে দেখেছি। আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমাজের আট-দশ জনকেও নতুন ক'রে দেখতে পেতাম - প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সেকেণ্ডে - তাহলে হয়তো নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়ে যে আনন্দ পাই সেই আনন্দ আমাদেরকে সব সময়ে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো। কারণ আমাদের চিন্তা ধারণা আমাদের

এটিটিউড - এই পোষাকগুলি খুলে ফেলার পর আমাদের মন সত্যের উন্মুক্ত আলোয় স্নান করতে পারতো। সত্যকে দেখাই শান্তি। চিন্তা শুধু কোথায় সত্য আছে, কোথায় নেই, কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু চিন্তা আমাদেরকে সত্যকে দেখতে সাহায্য করে না। সত্যকে দেখতে হলে চিন্তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার পর তাকে অপ্রয়োজনীয় ক'রে তুলতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে - চিন্তাকে তো সরাতে পারছি না। তাহলে এখন কী করা? আসলে এই জাতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে চিন্তাকে সরানো সম্ভব নয়। কারণ আপনি যখনই চিন্তাকে সরাতে চাচ্ছেন তখন আর একটি চিন্তাকে ঐ চিন্তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা চিন্তা-মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

চিন্তাকে সরাতে চাওয়ারই কোনো দরকার নেই। চিন্তার পিছন থেকে চিন্তাকে দেখতে হবে। চিন্তার সঠিক হক আদায় ক'রে মনের মধ্যে সঠিক ধর্মবোধটি তৈরি ক'রে ফেলতে হবে। তারপর চিন্তা ঐ বোধের মধ্যে লুকিয়ে পড়বে। তা নিজে বাইরে থেকে কোনো আলাদা সত্তা হিসেবে আমাদের চোখের সামনে বা মস্তিষ্কে এসে হাজির হবে না।

নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সুন্দর কিছু দেখার সময়ে আমরা যেমন নিষ্পাপ হয়ে যাই, আমরা আমাদের অন্তরকে যদি সেই অবস্থায় স্থির রাখতে পারতাম, তাহলে হয়তো দেখতাম যে সমাজে ভালোবাসার জন্য আমাদের লোকের অভাব নেই। আমি নিজের সন্তানকে ভালোবেসেও আনন্দ পাবো, পরের সন্তানকেও ভালোবেসে আনন্দ পাবো। হয়তো আমার দায়িত্ব পালনের রীতি একটু আলাদা হবে, কারণ নিজের সন্তানের প্রতি যতটুকু দায়িত্ব পালনের কথা এবং উচিত, অন্যের সন্তানের প্রতি ততটুকু দায়িত্ব পালন করার বাধ্যতা কারো

নেই। আর সে ক্ষমতাও কারো নেই। যদি কারও ক্ষমতা থাকে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।

মনের এই মূর্তি থেকে আমরা যদি রেহাই পাই, তাহলে মূলত মনের কাছ থেকেই রেহাই পাবো। মন খুবই চঞ্চল। চঞ্চল মানেই হচ্ছে, সে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হতে চায় না। আসলে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হওয়ার ক্ষমতাই তার নেই। কারণ তার চঞ্চলতাই তার জীবনকে নিশ্চিত করে। স্থির হলেই তার মৃত্যু ঘটে।

মন হচ্ছে ঢেউয়ের মতো। যে ঢেউ যদি নিজেকে সমুদ্র হিসেবে চিহ্নিত করতে শেখে, তাহলে কিন্তু সেই ঢেউয়ের উপস্থিতি সমুদ্রের জন্য ক্ষতিকর হবে না। সমুদ্র আসলে কোনকিছু দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। লক্ষ লক্ষ ঢেউ তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। তাতে তার কিছু আসে যায় না। কারণ সমুদ্র জানে প্রতিটি ঢেউই তার নিজেরই প্রকাশ। আমাদের মন হলো একটি সমুদ্রের ওপরে সংগঠিত এইসব ঢেউ। সুতরাং আমরা যদি জানতে পারি এবং অনুভব করতে পারি যে মন হলো একটি ঢেউ, তাহলে সেই মন আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকলেও আমাদের আর কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ সমুদ্রকে না দেখে কখনও আমি বুঝতে পারতাম না মনটি একটি ঢেউ কি না। সুতরাং ঢেউ আমার দৃষ্টিকে কখনোই আবদ্ধ ক'রে রাখবে না, বরং আমার দৃষ্টি যাবে সমুদ্রের প্রতি।

চঞ্চলতা মানেই হলো ঢেউ। এই ঢেউয়ের উৎস থেকে এই ঢেউয়ের মূলত কোনো পার্থক্য নেই। উৎস যা, প্রকাশও তাই। শুরুতে যা আছে, শেষেও তাই আছে। পার্থক্য তৈরি হয় আমাদের মনের মধ্যে গঠিত মূর্তির মধ্য দিয়ে। আমাদের দেখার অভ্যাসের কারণে।

মনের মূর্তি সম্পর্কে আর একটি বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। কোরআন নাযিল হয়েছিল ১৪০০ বছর আগে। ঐ সময়ে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত ছিল? আসলে এই তথ্য আমাদের কারো কাছে এসে পৌঁছায়নি। সুতরাং একটি আন্দাজ করা যেতে পারে। ধরা যাক দশ কোটি বা পাঁচ কোটি বা বিশ কোটি বা পঞ্চাশ কোটি। এই মুহূর্তে বর্তমান পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত? ছয় শত পঞ্চাশ কোটির বেশি। কোরআন যখন নাযিল হয়েছিল তখন যত লোকসংখ্যা ছিল, তার শতকরা কত ভাগ মূর্তি পূঁজা করত? আমরা এ ক্ষেত্রেও অনুমান ক'রে বলতে পারি যে, যেহেতু খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের বহুকাল অতিক্রান্ত হবার তখনও আল্লাহ্ কোরআন নাযিল করেননি, সেহেতু এই সময়ের অবসরে অনেক খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিও মিথ্যার আশ্রয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। তাছাড়া ঐ সময়ে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পূঁজা করত। মূর্তি পূজাই যে অধিকাংশ মানুষের প্রধান ধর্ম ছিল, তা আমরা কোরআন হাদিস ও ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করলে বুঝতে পারি। এবং কল্পনায় বর্তমান পৃথিবীকে কিছুদূর পেছনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সেটা বুঝতে পারি যে, ঐ সময়ে মূর্তির পূঁজারীর সংখ্যা বেশি ছিল।

এখন একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে - যদি কোরআন নাযিল নাও হতো, তবুও যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বর্তমানে যেভাবে বিকশিত, হয়েছে ঐ ভাবেই বিকশিত হতো, তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মূর্তি পূঁজারীর সংখ্যা ক'মে যেত। কারণ দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে বিমূর্ত বা abstract চিন্তা করতে শেখায়। মূর্তিকে মানুষ তখনই অবলম্বন করে যখন সত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে গিয়ে মন অপারগ হয়ে ওঠে এবং সে কোনো আকার খোঁজে। এই সুযোগ নিয়েই যুগে যুগে ইবলিস নিজেই মূর্তি পূঁজার প্রবর্তন করেছে এবং এটা টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু আসলে মূর্তি পূঁজার প্রবণতা নফসের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা - বিশেষ ক'রে মন যদি পরিশীলিত

বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে সেই মন যা ধরা যায়, যা ছোঁয়া যায়, যা দেখা যায়, যার ঘ্রাণ নেয়া যায় সেই রকম কোনো কিছু খুঁজবে। অবলম্বন ছাড়া অনেক মানুষের মনই সত্যের কাছে নিজেকে অর্পণ করতে পারে না। মূর্তিই সেই অবলম্বন, যা মানুষ অবলম্বন করে এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না ব'লে তার মির্থাত্ব তার চোখে ধরা পড়ে না।

এখন আমরা আর একটি উদাহরণ নিতে পারি। একটি ছোট শিশুকে যদি আপনি কোনো ধারণা বোঝাতে চান, তাহলে তাকে তা বোঝানো সম্ভব হবে না। এবং আপনি যদি তাকে বোঝাতে চান কোয়ালিটি মানে কী, বৈশিষ্ট্য মানে কী, ভালোত্ব, মন্দত্ব কী, তাহলে সে কখনোই তা বুঝবে না। কারণ abstract বা বিমূর্ত চিন্তার স্তরে সে এখনও পৌঁছায়নি। কিন্তু সেই জিনিষ আপনি যদি তাকে বোঝান যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায় ইত্যাদি, তাহলে তা বোঝানো খুব একটা কঠিন হবে না, যদিও সেই বিষয়টি তার অজানা। আসলে আমাদের চিন্তার মূর্তি-নির্ভরতাই এর আসল রহস্যকে প্রকাশ করতে পারে।

একটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিবর্তন ঘটে। গোটা মহাবিশ্বের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিবর্তন ঘটেছে। গোটা মানব জাতিও বিবর্তিত হচ্ছে বা হবে সেই বিবর্তন ডারউইনের কথা মতো বানর থেকে নাও হতে পারে, বা হতেও পারে - তা যদি হয়ও, তবুও কোরআন মিথ্যা কখনও হয়ে যাবে না, সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে না, কারণ সেই বিবর্তনের স্রষ্টা যিনি, আমি তো তাঁর কাছেই মাথা নত করছি। আর যদি ডারউইনের কথা সত্য নাও হয়, তবুও কিন্তু বিবর্তনকে অস্বীকার করার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে তিনি ছয় দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ধাপে ধাপে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ আর সব জায়গায় তিনি বলছেন যে

তিনি 'হও' বললে কোনোকিছু হয়ে যায়। তাহলে ছয় দিনে ব'সে পৃথিবী বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো হও ব'লে ব'সে থাকতে পারতেন এবং সব হয়েও যেত।

আসলে এই বিষয়টি বিবর্তনের আলোকে ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। বিবর্তন মানে হলো এই যে তিনি ইচ্ছা ক'রে সবকিছুর ওপর হস্তক্ষেপ ক'রে কোনো কিছু গঠন করেননি, বরং তিনি বস্তু ও শক্তির স্বভাব অনুযায়ী ব্যবস্থাবলীকে গঠিত হবার সুযোগ দিয়েছেন।

এভাবে আমরা আমাদের জীবনের দিকেও দৃষ্টিপাত করি। ছোটবেলায় আমরা বিমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম থাকি না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা যখন বড় হতে থাকি, তখন বিমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম হই। তার পরেও বিদ্যাশিক্ষার পথে না এগোলে কিংবা চিন্তাশীল মানুষের সাথে ওঠা-বসা না হলে বা তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে যদি নিজেকে গঠন না করা হয়, তাহলে কিন্তু আশি বৎসর একটা বৃদ্ধের মনেও বিমূর্ত চিন্তা প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। এখনও গ্রামে-গঞ্জে অনেককে দেখা যায় যারা এক দুই, পাঁচ, দশ এর চেয়ে বেশি গুনতে পারে না। দশ পার হওয়ার পর আবার দশ আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা বলে দুই দশ। অনেকে বলে দুই কুড়ি, তিন কুড়ি। তারা আসলে বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে না ব'লে তাদের চিন্তা পূর্ণাঙ্গতা এবং ধারাবাহিকতা পায়নি। কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করার যোগ্যতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। জীবন নিজেই একটি ধারাবাহিকা; অস্তিত্ব নিজেই একটা ধারাবাহিকতা। ধারাবাহিকতায় যদি কোথাও কোনো ছেদ পড়ত, তাহলে এই মুহূর্তের সঙ্গে পরবর্তী মুহূর্তের কোনো সম্পর্ক থাকত না।

এ কারণে যারা যত বেশি উচ্চ শিক্ষিত - জাগতিক অর্থে হোক আর আধ্যাত্মিক অর্থে হোক - তারা তত বেশি বিমূর্ত চিন্তায় পারদর্শী। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে, অন্তর যতি প্রশিক্ষিত হতে থাকে,

তত চিন্তার অবলম্বন হিসেবে তা বিভিন্ন স্তরের মূর্তিকে ত্যাগ করতে শেখে। আকার, কাঠামো, আকৃতি এগুলোর অবলম্বন ছাড়াই বিশুদ্ধ যুক্তির মাধ্যমে চিন্তা করতে শেখে। এভাবে মানুষের মধ্যে চিন্তার উদ্রেগ ঘটে, এবং মূর্তির অধঃপতন ঘটতে থাকে। এই বিষয়টিকে এভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্জন করেছি তাকে আমরা জ্ঞান বলব না, অভিজ্ঞতা বলব না - এটি মূলত একটি ***দৃষ্টিভঙ্গি***। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গোটা মানবজাতির দিকে তাকালে আমরা একটি চমৎকার জিনিষ লক্ষ করতে পারব। এখান থেকে সময়ের উজানে যত পেছনে যাওয়া যাবে, তত দেখা যাবে যে, মানুষ বেশি মূর্তিপ্রবণ এবং মানুষের চিন্তা, ভক্তি, ভালোবাসা, উৎসর্গ, উপাসনা সবকিছুই কমবেশি মূর্তিকে অবলম্বন ক'রেই। মূর্তির বাইরে গিয়ে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট চিন্তা করার যোগ্যতা খুব কম লোকের ছিল। কিন্তু সভ্যতার পরিবর্তন হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে, প্রসার ঘটেছে বিশুদ্ধ এবং বিমূর্ত চিন্তার এবং তা জ্ঞানের সব শাখাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বরং আমরা বলতে পারি জ্ঞানের অন্যান্য সব শাখাগুলোই বিমূর্ত চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং ইসলাম যদি পৃথিবীতে প্রেরিত না-ও হতো, তবুও মূর্তি পুজারির সংখ্যা অনেক ক'মে যেত। আমরা কম-বেশি সবাই জানি যে, অনেকে মূর্তি পূঁজা ছেড়ে দিয়েছে, এ কারণে নয় যে তারা ইসলাম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বরং এ কারণে যে মূর্তির অসারত্ব তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা ইব্রাহিম (আ.) এর আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিক যে সত্যটিকে আবিষ্কার করেছিলাম বিষয়টি তাই।

এখন আর একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আমরা নজর দিই। কোরআন যখন নাযিল হয়েছিল তখন মূর্তি পূজার ছড়াছড়ি ছিল। ঐ সময়কে যদি সর্বশেষ সময় হিসেবে বিবেচনা ক'রে কোরআন নাযিল হতো, তাহলে সেই কোরআনে বারবার মূর্তি পূঁজার প্রসঙ্গটি আসা খুবই স্বাভাবিক

ছিল। এবং ঘটেছেও তাই। গোটা কোরআনে আল্লাহ অধিকাংশ সময় ধ'রে তার নিজের তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মূর্তি থেকে আমাদেরকে স'রে আসতে বলেছেন। এবং এত বেশি বার তা বলেছেন, যা দেখে এই যুগে অনেকে প্রশ্ন তোলে - কোরআন কি আমাদের আধুনিক যুগের জন্যও নাযিল হয়েছে? নাকি শুধু ১৪০০ বছর আগের লোকদের জন্য নাযিল হয়েছিল? যদি আধুনিক যুগের জন্যও নাযিল হয়ে, থাকে তাহলে এত বার মূর্তির কথা সেখানে বলা হয়েছে কেন? বর্তমান পৃথিবীতে কয়জন ব্যক্তি মূর্তি পূঁজা করে? আসলে, বর্তমান পৃথিবীতে খুব কম লোকই মূর্তি পূঁজা করে। তাহলে কেন কোরআনে মূর্তি পূঁজার প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে? সেই প্রসঙ্গের সংশ্লিষ্ট আলোচনায় গোটা কোরআন কেন ভরপুর? তাহলে কি কোরআন এই যুগের মানুষের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন নেই? এই জাতীয় প্রশ্ন অনেকে উত্থাপন ক'রে থাকে।

এই প্রশ্নের সংগত কারণ আছে। একটি বিষয় তারা অনুধাবন করতে পারে না ব'লেই তাদের মধ্যে প্রশ্নগুলি জাগে। তা হলো এই যে, কোরআনে যখন আল্লাহ মূর্তি নিয়ে কথা বলেছেন, তখন তিনি দুই স্ত রের মূর্তি নিয়ে কথা বলেছেন - বাহ্যিক অর্থে নিজের তৈরি করা মূর্তি, যাকে কেউ সিজদা করছে বা যার উপাসনা করছে, একই সঙ্গে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির ইমানদার কিংবা বেঈমান কিংবা নাস্তিক কিংবা মোনাফেক যার কথাই বলি না কেন, প্রতিটি ব্যক্তির মনের মধ্যেই মূর্তি রয়েছে, যা আমরা এর আগে বিভিন্ন আলোচনায় দেখেছি, সেই মূর্তির প্রতি তিনি বার বার ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীতে আক্ষরিক অর্থে মূর্তি পূঁজারীর সংখ্যা কম হলেও সূক্ষ্ম বা অ্যাবস্ট্রাক অর্থে মূর্তি পূঁজারীর সংখ্যার মধ্যে খুব বেশি ঘাটতি নেই। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এখনও মূর্তির পূঁজার ট্রেডিশন বা প্রথার মধ্যে আবদ্ধ। প্রথাও কিন্তু এক ধরনের মূর্তি। কালচার একটি বিশেষ

সম্পর্ককে বা রাজনৈতিক বিশ্বাস, যার কারণে অন্য যে কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের কোন্দল লাগে কিন্তু এক ধরনের মূর্তি। এই মূর্তি থেকে বের হয়েও কিন্তু রাজনীতি করা সম্ভব। মানুষ রাজনৈতিক জীব। রাজনীতি থেকে তার কোনো রেহই নেই। রাজনীতি তাকে করতেই হবে। মানুষকে এমন অসহায় হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করার এবং একটি নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনার দায়িত্ব মানুষের নিজেরই ওপরে বর্তেছে। বাইরে থেকে কোনো শক্তি প্রয়োগ ক'রে তা কখনও ক'রে দেয়া হবে না। যদি কখনও তা ক'রে দেয়া হয়, তাহলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। নতুন ক'রে শুরু করার আর কিছু থাকবে না। আমাদের দেশে আবাহনী মোহামেডান এর খেলা নিয়েও মারামারি হতে দেখা গেছে। দুটি দল খেলছে - এ হলো মানুষের চিত্তবিনোদনের একটি উপায়। খেলাধুলা সবাইকে আনন্দ দেয়। এক দল জেতে আর এক দল হারে, কিন্তু দর্শক সব সময়ে আনন্দ পায়। দর্শকের মধ্যে যাদের মনোনীত দল হেরে যায়, তারাও চোখের পানি ফে'লে এক ধরনের আনন্দ পায়। বিশেষ কোনো দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তাদের একটি গর্ববোধ দান করে - এতে কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু অন্য দলের সঙ্গে আমার হারা-জেতার এই যে পার্থক্যটুকু তৈরি হয়, এটির কারণেই যে অন্য দলের সঙ্গে আমাকে মারামারিতে লিপ্ত হতে হবে, সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে, এবং আর দশজনের ক্ষতির কারণ হতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ আলাদা। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে অন্য যে কোনো মানুষের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাই ব'লে কি দু'জনের মধ্যে গণ্ডগোল লাগতে হবে? আসলে আমাদের যে কোনো দুই দলের মধ্যে পার্থক্য মূলত আমাদের সংকীর্ণতাকেই প্রকাশ করে। পার্থক্যই আমাদের অস্তিত্বকে নির্ধারণ করেছে। এখন আমাদের উচিত এই পার্থক্যের মধ্যে লুকানো যে মিল রয়েছে, সেই মিলটিকে আবিষ্কার করা, এবং সেই মিলের স্তর থেকে সমস্ত আচরণগুলো করা। তাহলে পার্থক্যও থাকবে,

মিলও থাকবে। এর নামই আসল প্রেমের খেলা। বৈচিত্র্য। একত্বের প্রকাশ।

সুতরাং আমরা স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করলাম যে, গোটা কোরআন যে মূর্তি পূজার ইঙ্গিত এবং তার মিথ্যাত্ব বর্ণনায় ভরপুর - তা এ কারণে নয় যে বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোকই মূর্তি পূজারী। কারণ বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোকই মূর্তি পূজারী নয়। বর্তমান পৃথিবীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই একেবারেই নাস্তিক, যারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না। এদের কথাও কোরআনে বলা হয়েছে। অন্য কোনো প্রসংগে বা বইতে ইনশাল্লাহ এ কথা বলব । কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে মূর্তি পূজারী নয়, এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তার পরও এত বার বার এই মূর্তি পূঁজার প্রসঙ্গটি এসেছে, এবং মূর্তি পূজা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে, শুধু এ কারণে যে, মনের মূর্তি থেকে কেউই রেহাই পায়নি। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) তাঁর তাওহীদের তরবারি দিয়ে আমাদের এই মনের মূর্তির ওপরে চরম কুঠারাঘাত হেনেছেন, আমাদের মনের মূর্তির মস্তক ছিন্ন ক'রে ফেলেছেন। আমি বিশেষ ক'রে আমার পাঠকগণকে অনুরোধ করব তাঁর *ফাতহুর রব্বানী* এবং *ফুতুল গায়েব* সারা জীবন পড়ার। এবং আর একটি অনুরোধ ক'রে রাখব - তাঁর বইগুলো যখন কেউ পড়বেন, দয়া ক'রে কোনো জ্ঞানার্জনকে লক্ষ্য রেখে পড়বেন না। পড়বেন নিজেকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে। জ্ঞান অর্জন অঢেল হয়েছে, এবং তা আমাদের এবং আমাদের অন্তরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই ব্যবধানে থাকা অবস্থায় আমাদেরকে সত্যকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, এবং চিহ্নিত করার পর আমরা যদি জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল না থাকি, তাহলেই স্বাধীন হয়ে যাব। আর যদি প্রতি ক্ষেত্রে আমরা জ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে যাই, তাহলে ঐ জ্ঞানের ওপরেও যে আরও বিশুদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গতামুখী জ্ঞান রয়েছে, তা আমরা কখনোই আবিষ্কার করতে পারব না। আসলে

জ্ঞানের রয়েছে অনেক স্তরভেদ। সচরাচর একটি বাহ্যিক তথ্যপুঞ্জকে অনুভূতির সঙ্গে এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে পারলেই তাকে আমি জ্ঞান বলি। তা যে জ্ঞান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এই জ্ঞানই জ্ঞানের শেষ নয়।

যা হোক, আমরা এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, আমাদেরকে মনের মূর্তি থেকে রেহাই পেতে হবে। এবং মনের মূর্তি থেকে রেহাই পেতে পারলে আমরা মূর্তির রহস্যকে জানতে পারব, যা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। এবং এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা ব'লে নেয়া খুব জরুরি মনে করছি: হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর মতো লোকের বই না প'ড়েও যদি আপনি ভালো থাকেন, যদি শুধু এস.এম. জাকির হুসাইনের বই প'ড়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমি মনে করব আপনার এই সন্তুষ্টি গাফিলতিতে পূর্ণ এবং কিছু ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। গোটা মহাবিশ্বের রস নিংড়ে এই রকম মানব সন্তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাঁরা সত্যকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সত্যকে ধারণ ক'রে রেখেছেন, মৃত্যুর পরেও তাদের মৃত্যু হয়নি - এ রকম মানব সন্তানকে আমাদের মধ্যে পেয়েও যদি আমরা তাদের রেখে যাওয়া উচ্ছিষ্ট আহার না করি, তাহলে আমাদের অন্তরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কখনোই মিটবে না।

((সিদ্ধান্তের ধ্বংস))

আমরা জানি যে আমাদের মনের মধ্যে অনেক শক্তি রয়েছে, যা প্রয়োগ ক'রে আমরা অসাধ্য সাধন করতে পারি। কিন্তু মনের অধিকাংশ শক্তি প্রয়োগ ক'রে আমরা জ্ঞান অর্জন করি, চিন্তা করি, অনেক কিছু আয়োজন ক'রে ফেলি, কিন্তু শেষে গিয়ে এক সেকেণ্ডের ভুলে আমরা সবকিছু হারিয়ে বসি। কী সেই জিনিষটি? যা এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে এবং তার কারণে এতক্ষণে মনের মধ্যে যে সব আয়োজন করেছিলাম তা সব পণ্ড হয়ে যায়? তা হলো সিদ্ধান্ত। ব্যাপারটি যেন এমন যে, আমাদের এ রকম অভ্যাস হয়ে গেছে যে, আমরা যখন চিন্তা করি, তখন তা করি দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য, কোনো একটি উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য। ফলে হয় কি, এক দিক থেকে চিন্তা সহজ এবং বাস্তবসম্মত হতে চায়, কিন্তু অন্য দিকে চিন্তা মাঝ পথে থেমে গিয়ে তার সোনার ফসল ফলাতে ব্যর্থ হয়।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন - সিদ্ধান্ত নিব না, অথচ চিন্তা করব, সে কেমন? তখন তো চিন্তা অনন্ত কাল ধ'রে চলতেই থাকবে। দেখুন, অনন্তকাল ধ'রে আমরা বেঁচে আছি - অন্তত কখন থেকে আমাদের জন্ম শুরু হয়েছে তা আমরা জানি না, মনেও নেই; এই অর্থে আমরা বলতে

পারি অনন্তকাল ধ'রে আমরা বেঁচে আছি, কারণ অনিশ্চিতকাল ধ'রে আমরা বেঁচে আছি। এবং কবে মরবো তাও জানি না। সুতরাং অনিশ্চিতকাল পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকব। এই অনিশ্চয়তাবোধ আমাদের মধ্যে এক ধরনের অনন্তবোধ জাগিয়ে তোলে। তার পরেও তো আমরা এই বেঁচে থাকা নিয়ে কোনো ক্লান্তিবোধ করছি না। অনন্ত কাল যদি চিন্তা করতে হয়, তাহলে হয়তো আমরা চিন্তার মধ্যে আটকে যাব, বা পাগল হয়ে যাব।

কিন্তু অনন্তকালের চিন্তা ব'লে আসলে কিছু নেই। আল্লাহ ছাড়া সবই অস্থায়ী। চিন্তা, সুখ, দুঃখ, কষ্ট সব কিছুই অস্থায়ী। যদি আমরা দুঃখে পতিত হওয়ার পর মনে করি যে এই দুঃখ কখনও সারবে না, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা আল্লাহকেই ছোট ক'রে দেখলাম। তাঁকে চিরস্থায়ী না ভেবে দুঃখ-কষ্টকে চিরস্থায়ী ভেবে বসলাম। তা আসলে ঠিক নয়।

সচরাচর আমরা চিন্তা ক'রে থাকি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে। ফলে আমাদের বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা চিন্তা করব না। এভাবে আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার শেষ হয়ে যায়, আর চিন্তার সমাপ্তি ঘটে ব'লেই আমরা কাজ শুরু করতে পারি। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণ একমাত্র তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়, যখন কাজ করতে হবে। অর্থাৎ কোনো কাজের প্রথমে থাকে পরিকল্পনা, যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সেখান থেকে শুরু হয় সেই কাজটি। কাজ চলাকালীন ঘটে সেই কাজের পর্যবেক্ষণ এবং কাজের শেষে থাকে তা উদ্দেশ্য অর্জনে কতখানি সফল হলো তা বিশ্লেষণ। এভাবে আমরা দেখি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে একটি চিন্তা শেষ হয়ে গেলেও যে প্রক্রিয়ার

একটি অংশ হলো সেই চিন্তা, সেই প্রক্রিয়াটি শেষ হয় না - তা চলতে থাকে। ফলে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানে চিন্তার পরিসমাপ্তি। এখন, চিন্তা যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তার পরিসমাপ্তি নিশ্চয়ই কোনো সুখকর পরিণতি বহন করবে না। চিন্তাকে আমরা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থামিয়ে দিলাম। থেমে যাওয়ার পর আমি কী পেলাম? দৈনন্দিন জীবনে আমরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ চিন্তা থেমে যাওয়ার পর আমরা পাচ্ছি কাজ। কিন্তু সত্যকে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যখন আমরা যখন চিন্তা করি, তখন সেই চিন্তা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে চালিত হলে তা কখনোই কোনো সোনার ফসল ফলাতে পারবে না। অথচ দৈনন্দিন জীবনে আমরা চিন্তাকে যেভাবে ব্যবহার করি, সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তাকে সচরাচর সেইভাবে ব্যবহার করতে চাই। আমাদের এই অভ্যাসটি আমাদের মনের একটি পর্দা ফেলে রাখে, এই প্রচ্ছন্ন পর্দা আমাদের অন্ধত্ব হিসেবে কাজ করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে কত সংকীর্ণতার পরিচয় বহন করে, তা একটি উদাহরণ দেখলেই বুঝতে পারব। ধরা যাক বাংলাদেশের বিশেষ একটি অঞ্চলের একটি লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। সেই লোকটি কোনো না কোনোভাবে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করল। ফলে তার সম্পর্কে আমার একটি খারাপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। পরবর্তীতে ঐ অঞ্চল থেকে আগত এক বা একাধিক ব্যক্তির মুখোমুখী হলে আমি একই সন্দেহ এবং অনাস্থা নিয়ে তাদের দিকে তাকালাম, এবং মনে করলাম যে ঐ অঞ্চলের সব লোকই সম্ভবত তার মতো। অর্থাৎ আমি

একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেললাম। আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত আমার অন্তরকে সংকীর্ণ ক'রে দিয়েছে। এভাবে কোনো কর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছাড়া যখনই আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ ক'রে দেয়।

প্রশ্ন উঠতে পাওে, পর্যাপ্ত তথ্যের উপস্থিতি ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক নয় - এই কথাটি মানা গেল, কিন্তু কতটুকু তথ্যকে আমরা পর্যাপ্ত তথ্য বলব, সে ব্যাপারে কি কোনো পরামর্শ রয়েছে? আমাদের জবাব হলো, তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সচরাচর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আমাদের লক্ষ্যের ভিত্তিতে। কোনো লক্ষ্য অর্জনের সময়ে কী কী তথ্য প্রয়োজন তা পরিকল্পনার সময়ে আমাদের অন্তরে এমনিতেই ভেসে ওঠে, বা একটু চিন্তা করলেই সে সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব। আর তখন সেই তথ্যকে আরও অনেকভাবে পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, হাজারও তথ্য জোগাড় ক'রেও কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ নয়। বরং তা অন্তরের সংকীর্ণতার সৃষ্টি করবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণটা কী?

আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য কী? সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য চিন্তার স্ত র থেকে অতিক্রম করার পর কাজ শুরু করা। আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে, যদি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চিন্তা শেষ করা হয় তাহলে তার পর কোন কাজটি শুরু করব?

এখন আমাদের চিন্তার অসারত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা নিজেই একটি কাজ। সুতরাং তাকে শেষ ক'রে অন্য একটি কাজে উপনীত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কখনও কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত হয় না বরং চিন্তা সংঘটিত হয় বিভিন্ন বিভ্রান্তি থেকে অন্তরকে রক্ষা করার জন্য।

আমরা দেখেছি যে, হুট ক'রে পর্যাপ্ত তথ্য গ্রহণ ছাড়াই আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলি এবং সেই সিদ্ধান্ত আমাদের অন্তরকে একটি ধারণা দান করে। একটি দৃষ্টি দান করে। সেই দৃষ্টি দিয়েই আমরা অন্যদের দিকে তাকাই। ফলে আমরা সত্যকে দেখি না। এবার কিন্তু আমাদের আসল বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আমরা একটি দৃষ্টি লাভ করি। এই দৃষ্টি যদি হয় ভ্রান্তিপূর্ণ, সংকীর্ণ, তাহলে তা দিয়ে সত্যকে দেখা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে: সিদ্ধান্ত গ্রহণ না ক'রে চললে তো চিন্তা অনন্তকাল ধ'রে চলতে থাকবে। তা কি সম্ভব? কিংবা তা কি কোনো ভালো ফল বয়ে আনবে? আমাদের জবাব হলো: **আমরা চিন্তা করি চিন্তার দাবি শেষ করার জন্য**। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলার উপায় নেই যে, আমরা চিন্তা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা যেন চিন্তার দাবি আদায় ক'রে ফেলে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। এবং তার পর আমাদের শুরু হবে ***দেখার*** পালা। অন্তর সত্যকে দেখবে। এই দেখা থেকে যে জ্ঞান আসবে, সেই জ্ঞানে কোনো তথ্য নাও থাকতে পারে। সেই জ্ঞানে কোনো শব্দ, ভাষা নাও থাকতে পারে। তবে সেই জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ এবং সেখান থেকেই ভাষা উঠে আসে। ভাষার ব্যাকগ্রাউন্ডে এই যে জ্ঞান, তা আমাদের অন্তরের সক্রিয়তা এবং সচেতনতার সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে তার রয়েছে বিভিন্ন স্তরভেদ। কিন্তু তবুও যাবতীয় স্তরের সম্মিলিত অবস্থা অসীমকে নির্দেশ করে। ফলে সেই জ্ঞানের কোনো শুরু নেই, শেষ নেই।

একটি বিষয় আমরা লক্ষ করতে পারি। এক মা, এক বাবা, এক ভাই ইত্যাদি নিয়ে আমরা আজীবন বেঁচে থাকি। বরং এগুলো আমরা পাল্টাতে চাই না, বা এ কারণে ক্লান্ত হই না। কিন্তু এক স্ত্রী, এক স্বামীতে যে আমাদের সব সময়ে অভিযোগ এবং ক্লান্তি রয়ে যায়। বাস্তবে আমরা স্ত্রী পরিবর্তনের বা স্বামী পরিবর্তনের পথ বেছে না নিলেও অন্তরে এই বিষয়টি আমরা অনুভব করি যে, এখানে একটি পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের প্রশ্ন হলো:

কেন?
আমি বলছি না এই পরিবর্তনের যে তাগিদ অন্তরে অনুভূত হয়, তা ভালো বা মন্দ। আমি কোনো পক্ষেই যাচ্ছি না। সেটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই পরিবর্তনের কামনা কেন আমাদের অন্তরে জাগে, সেটি খতিয়ে দেখা।

আসলে যে কোনো পরিবর্তনই প্রকৃতির নিজস্ব চিন্তা। আমরা যখন মাথার মধ্যে চিন্তা করি, তখন কী করি? আমি সচরাচর এই সংজ্ঞাটি দিয়ে থাকি - Thinking is linking. চিন্তা হলো দুই বা ততোধিক তথ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। যখন আমরা মাথার মধ্যে কেনো কিছু নিয়ে চিন্তা করি, তখন একাধিক তথ্যবিন্দুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করি। এবং আবিষ্কার করার চেষ্টা করি যাবতীয় তথ্য যে ব্যাকগ্রাউন্ডকে নির্দেশ করে তা কী?

আমি যখন আমার বাবাকে দেখি, মাকে দেখি, সন্তানকে দেখি তখন আমাকে কোনো চিন্তা করতে হয় না। আমাদের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা নিয়ে চিন্তা ক'রে সেই বিষয়টি আবিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে চিন্তার কোনো ভূমিকাই নেই। আর চিন্তার কোনো ভূমিকা সেখানে নেই ব'লে আমরা সেখানে কোনো পরিবর্তন আশা করি না।

চিন্তা নিজেই একটি পরিবর্তন। আমাদের মাথায় যখন চিন্তা সংঘটিত হয়, তখন আমরা একটি তথ্য থেকে অন্য একটি তথ্যে আমাদের সচেতনতাকে পাঠিয়ে দেই, এবং এভাবে আমাদের মনের মধ্যে কাজ চলতে থাকে। একটি গতির সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সেই যাত্রা সমাপ্ত হয়, এবং আমরা একটি দৃষ্টি পেয়ে যাই। আসলে, আমি যখন আমার সন্তান ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাব তখন তার এবং

আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, বা ঘটা উচিত কি না, বা তার প্রতি আমার কতটুকু সদয় হওয়া বা তাকে আমার কতটুকু ভালোবাসা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে আমি চিন্তা করতে শুরু করব। এটাই প্রমাণ করে এই যে, তার মুখের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমি দেখতে চাচ্ছি ব'লেই তা নিয়ে চিন্তা করছি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা যখন কোনো চিন্তা করি, তখন তা এ জন্যে করি যে, চিন্তার যে আবর্জনা এবং পর্দা আমার এবং সত্যের মাঝামাঝি স্থাপিত হয়েছে, তার শক্তিটুকু নিঃশেষিত হয়ে যাক, যেন অবশেষে আমি সত্যকে তার নিজের মতো ক'রেই দেখতে পাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে: চিন্তার উভয় দিকটিকেই সঠিক ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করা যাচ্ছে না। তাহলে অন্তরকে কি চিন্তামুক্ত ক'রে ফেলতে হবে? এবং যদি তা করতে হয়, তাহলে তা কিভাবে করতে হবে? আমরা এখন খুব সঠিক প্রশ্নটিতে এসে হাজির হয়েছি। এবং আমাদের জবাব হলো: চিন্তা কখনোই আমাদের অন্তর এবং সত্যের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতো না, যদি না আমাদের চিন্তার শুরুতেই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা কাজ করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা চিন্তার শুরুতেই কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই সে ব্যাপারে মন স্থির করে রাখি - সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক। ফলে চিন্তার শেষে আমরা সেই পুরনো বিন্দুতেই উপনীত হই - নতুন কিছু লাভ করতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি এ কথাটি সব সময়ে মনে রাখি যে, আমরা যখন চিন্তা করব, তখন চিন্তা তার নিজেস্ব গতিবিধি অনুযায়ী চলতে চলতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, সেটিই আমরা গ্রহণ করব, আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত অন্তরে জিইয়ে রাখবো না বা এক জায়গার সিদ্ধান্ত আর এক জায়গায় প্রয়োগ করব না, তাহলে কিন্তু চিন্তা আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ ক'রে দেবে না।

এখন এখানে আর একটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়ঃ কী ক'রে বুঝবো কখন চিন্তা নিজেই যুক্তির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছালো, আর কখন তাকে জোর ক'রে একটি সিদ্ধান্তে র দিকে ঠেলে দেওয়া হলো? অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকে একটু বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে।

আসলে যে চিন্তার আগে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে সে ব্যাপারে কোন মনোভাব গঠন করা হয় না, সে চিন্তাই হলো সৃজনশীলতা বা ক্রিয়েটিভিটি। সৃজনশীল চিন্তা মূলত কোনো চিন্তা নয়, ফলে চিন্তা করতে হলে মাথার মধ্যে যে কষ্ট অনুভূত হয়, সৃজনশীল চিন্তার সময়ে সেই কষ্ট তো অনুভূত হয়ই না, বরং আনন্দ অনুভূত হয়। সৃজনশীল চিন্তা হলো ***দেখার*** একটি উপায়। আমরা অনেক সময়ে তাই শুনি যা শুনতে চাই, কিন্তু আমরা তা দেখি না যা দেখতে চাই। কারণ দৃষ্টি হলো শ্রবণের চেয়ে অনেক প্রত্যক্ষ। বরং আমরা যা দেখি তা দেখার পরে নিজেকে প্রশ্ন করি - আদৌ এই জিনিষটি আগে দেখেছিলাম কি না।

আগে থেকে নির্ধারিত সিদ্ধান্তবিহীন চিন্তা হলো একটি স্বচ্ছ আয়নার মতো। আয়নার মধ্যে আমরা কী দেখি? তার সামনে যা রয়েছে তাকেই আয়নার মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ আয়নার মধ্যে বাস্তবতারই প্রতিবিম্ব দেখি। আয়না কি বাস্তবতাকে নির্মাণ করে? কিংবা তাকে রচনা করে? না। বরং বাস্তবতা যে রকমের আয়না তাকে ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করে। সিদ্ধান্তমুক্ত চিন্তা ঠিক একই রকমের। সেই চিন্তার বিষয়বস্তু সেই চিন্তার আয়নাতে প্রতিফলিত হয় এবং তখন আমরা তাকে দেখতে পাই।

এখন আমরা আর এক ধাপ এগিয়ে যাই এবং একটু প্রায়োগিক চিন্তা করি। কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা থেকে মনকে রক্ষা করতে হবে? এ ক্ষেত্রে কিছুটা অভ্যাস গঠন করা জরুরী। কিন্তু ভুল উপায়ে অভ্যাস গঠন করলে তাতে ক্ষতি ছাড়া উপকার হবে না। তাই সঠিক জিনিষটিকে আগে জেনে নিতে হবে। আমরা যখনই কোনো কাজ করার উদ্দেশ্যে চিন্তা করি, তখন সে চিন্তা হয় আমাদের টেকনোলজিক্যাল বা প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টার অংশ। যেমন আমি চিন্তা করছি কিভাবে একটি রাস্তা তৈরি করতে হবে। আমার এ চিন্তার মধ্যে গোটা রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেলে তারপর আমার রাস্তার বাস্তব নির্মাণ কাজ আবার শুরু হবে।

অর্থাৎ একটি কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা দুইটি পর্যায়কে চিহ্নিত করছি - তার একটি পর্যায়কে আমরা চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্বারা আলাদা করে ফেলছি। এবং আর একটি পর্যায়কে কাজ দিয়ে আলাদা ক'রে ফেলছি। এই অর্থে চিন্তা নিজেই কোনো উদ্দেশ্য নয়। এবং তা কোনো কিছুকে বা কোনো প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দিতে পারে না। বরং পরবর্তীতে শুরু হবে এমন প্রক্রিয়ার পথ খুলে দেয়। কিন্তু আমরা যখন কোনো কাজ করার উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিন্তা করি, তখনই আমরা সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হই। আমরা যে উদাহরণটি দেখেছি সেই উদাহরণটি এই বিষয়টি বোঝার জন্য যথেষ্ট। চিন্তার লক্ষ্য নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ নয়। চিন্তার লক্ষ্য হলো বাস্তবতাকে দেখা। কোনো না কোনো কারণে বাইরের চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি না ব'লেই চিন্তার টর্চলাইটের মাধ্যমে অজ্ঞতা এবং অস্পষ্টতার কুয়াশা ভেদ ক'রে আমাকে সত্যকে দেখতে হচ্ছে। এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে, এই চিন্তাও নিজেই একটি কুয়াশা, এবং তা অপসারিত হওয়ার পর সত্যকে দেখা গেলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে যে, আমি সত্যকে দেখেছি ।

সঠিক আধ্যাত্মিক চিন্তা হলো সেই চিন্তা যার উদ্দেশ্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নয়, বরং যার উদ্দেশ্য হলো যে বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে তার সঠিক রূপটি আবিস্কার করা। এভাবে চিন্তার দ্বারা কেনো কিছু আবিস্কার করা সম্ভব হলেও সেই চিন্তা তার শক্তি হারাবে না, কারণ তা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করলে আরও নতুন কিছু আবিস্কৃত হতে পারে, এই বিশ্বাসটি অন্তরে কাজ করবে। সিদ্ধান্তবিহীন চিন্তাকে আমরা বলি খোলা মন বা ওপেন মাইন্ড। এরূপ খোলা মন নিয়ে কেউ যদি কোরআন পাঠ করেন, তাহলে আজ হোক আর দুই বছর পরেই হোক, তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে এই কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়। এবং তখনই তার কাছে কোরআনের বাণী স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অন্য ক্ষেত্রে এমনকি বিশ্বাসীর কাছেও কোরআনের বাণী স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। কারণ আমার চিন্তা যদি আমার সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে আমার অন্তর মেনে নিতে পারবে না; এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে সংঘাত লাগবে। আমরা কোরআন পড়ার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই এই সংঘাতের উপস্থিতি অন্তরে টের পাই। কোরআন পড়ার আগে তা আল্লাহর বাণী, না কি মানুষের বাণী সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত ছাড়াই যদি কেউ কোরআন পড়েন, তবুও তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন যে তা কোনো মানুষের বাণী নয়, আল্লাহর বাণী। অসংখ্য উপায় রয়েছে কোরআনের সত্যতা উপলব্ধি করার এবং প্রমাণ করার। এই উপায়গুলি তখনই অন্তরের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আমরা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই কোরআনের কাছে যাই এবং আমাদের অন্তর এক পর্যায়ে সত্যকে এমনভাবে উপলব্ধি করে যে, তাকে নতুন ক'রে চিন্তা করতে হয় না, বরং সে শুধু দেখতেই থাকে, আর এই দেখাই হয় জ্ঞানের উৎস।

(শব্দের পেছনে)

ভাষা মানব জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তার তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে অনেক কিছুই মানুষের এখন জানা। নোয়াম চমস্কি বলেছেন - ভাষা হলো চোখ, কান, হাত, পা, জিহ্বা ইত্যাদির মতো একটি অঙ্গ, যা দেখা যায় না, কিন্তু এই অঙ্গটি মানুষের দেহের এবং মনের অন্যান্য সবগুলি অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক মতবাদ দিয়েছেন, যা এখনও পর্যন্ত অস্বীকার করার সম্ভব হয়নি এবং প্রমাণ করাও যায়নি। ভাষা যে সত্যিকার অর্থে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তা সম্ভবত তিনিই প্রথমে তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করেছিলেন। এই হলো চিন্তা-ভাবনা এবং তথ্যের দ্বারা সমর্থিত গবেষণার জগতের কথা।

কিন্তু সব যুগে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যারা পারদর্শী ছিলেন তারা এই সত্যগুলো আগে থেকেই জানতেন। তাদের কাছে এই বিষয়টি নতুন কিছু ছিল না। তার কারণ এই নয় যে তাদেরকে কেউ ভাষা-জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন বা তারা ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বরং তার কারণ এই যে, তারা চিন্তার সন্ধান পেয়েছিলেন ভাষারও পশ্চাতে। অর্থাৎ তাদের অন্তর এমন জগৎ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতো যেখানে ভাষা পৌঁছায় না।

ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা কী আমরা শুধু তাই বিবেচনা করব। ভাষা ছাড়া কোনো ধর্মীয় উপাসনা সম্ভব হতো না। ভাষা ছাড়া কোনো প্রার্থনা করা যায় না। ভাষা ছাড়া আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না। এ সব আমরা খুব স্বাভাবিক ভাবেই জানি। আমাদের কাণ্ডজ্ঞানই ব'লে দেয় ভাষা আমাদের নিদ্রা জাগরণ সহ জীবনের সমস্ত স্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে। তার জন্য নতুন কোনো গবেষণার প্রয়োজন হয় না। নতুন ক'রে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নতুন ক'রে প্রশ্ন না করলে আমরা জানা বিষয়কে ভালোভাবে জানতে পারি না। ফলে অল্প-জানা অবস্থায় মনে ক'রে ফেলি যে আমরা অনেক জেনে ফেলেছি। আর এভাবে আমাদের তৃষ্ণা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যায়। তাই এখন আমরা কিছু মৌলিক প্রশ্ন করতে চাই।

•

যেই মুহূর্তে আপনি নামাজে দাঁড়ান তখন আপনার মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা এসে হাজির হয়। আমি বিভিন্ন বইতে বলেছি যে এই বিষয়টি দ্বারা নামাজের অলৌকিকত্বের প্রমাণটা হয়ে যায়। নামাজের এক সেকেণ্ড আগে মনের যে অবস্থা ছিল, এবং নামাজ শেষ হয়ে গেলে এক সেকেণ্ড পরে যে অবস্থা হবে, তা থেকে নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় মনটা যে অবস্থায় বিরাজ করে, তা একেবারেই আলাদা। এ থেকে বোঝা যায় যে নামাজ দৈনন্দিন জীবনের কৃত্রিমতাপূর্ণ আচার-আচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। কি তা? কেন এ রকম হয়? - সে বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অল্প-বিস্তর বলেছি, তবে খুব বিস্তারিতভাবে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রেখে আমরা তেমন কিছু বলিনি। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার সম্ভবও নয়। তা আলোচিত হবে 'স্বচ্ছ নামাজ' নামক বইতে, ইনশাল্লাহ। তবে সঙ্গতভাবে এখানে কিছু আলোচনা চ'লেই আসবে।

আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আমাদের মাথায় চিন্তাগুলো এসে হাজির হয়। এই চিন্তাগুলো ভাষার হাত ধ'রে আসে, দৃশ্যমান চিন্তাও আসে।

আমরা যখন চুপচাপ থাকি, কোনো কথা না বলি, তখনও চিন্তা করি, এবং ভাষার মাধ্যমেই চিন্তাগুলো সংগঠিত হয়। এ থেকে এ রকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে ভাষার মাধ্যমেই চিন্তার উদ্রেগ ঘটে। বরং ভাষা একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে চিন্তা প্রবাহিত হয়, এবং তার প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ চিন্তার অপ্রকাশিত রূপও রয়েছে। এই আলোচনার জন্য উপযুক্ত বই এটি নয়, কারণ এই আলোচনা এত বিশাল যে, এখানে তা পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। তবুও প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি চলে আসে তাই এখানে কিছুটা অবতারণা করছি।

আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি কোরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। বহু জায়গায় কথাটি বলা হয়েছে। আমরা নিচের আয়াতগুলি দেখি:

> *কোরআন আমি তো আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমার কাছে এ-কোরআন প্রেরণ ক'রে আমি তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো কাহিনী বর্ণনা করেছি, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অসতর্কদের অন্তর্ভুক্ত।*
>
> *(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২-৩)*

> *এভাবে আমি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরও তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুনরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।*
>
> *(সূরা রা'দ, আয়াত: ৭)*

এভাবে আমি আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর ওর মধ্যে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে ওরা ভয় করে বা স্মরণ করে।

(সূরা তাহা, আয়াত: ১১৩)

নিঃসন্দেহে এই বিশ্বজগতে প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। রুহ্-উল-আমিন (জিবরাইল) এ অবতীর্ণ করেছে। তোমার হৃদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। এ (অবতীর্ণ করা হয়েছে) পরিস্কার আরবি ভাষায়। নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তীদের জুবুরে (কিতাবগুলোয়)। এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয় যা বনি-ইসরাইলি পণ্ডিতরা জানত?

সূরা শোআরা, আয়াত: ১৯২-১৯৭)

আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় এ-কোরআন, এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

(সূরা জুমার, আয়াত: ২৭-২৮)

হা–মিম! এ পরম করুণাময়, পরম দয়াময়ের কাছ থেকে অবতীর্ণ। এই আরবি কোরান যারা বোঝে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, কিতাবের আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়, সুসংবাদ দেয় ও সতর্ক করে। কিন্তু অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে ওরা শুনতে পায় না।

(সূরা হা-মিম-সিজদা, আয়াত: ১-৪)

এইভাবে আমি তোমার কাছে আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার নগরমাতার

(মক্কার) অধিবাসীদেরকে ও তার আশেপাশে যারা বাস করে তাদেরকে আর সতর্ক করতে পার সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে ও আর-এক দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(সুরা শুরা, আয়াত: ৭)

হা-মিম! শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি আরবি ভাষায় এ-কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর এ তো রয়েছে আমার কাছে মহান জ্ঞানগর্ভ উম্মুল কিতাব (গ্রন্থের মাতা অর্থাৎ মূল গ্রন্থ)-এ।

(সূরা জুখরুফ, আয়াত: ১-৪)

এর পূর্বে আদর্শ ও অনুগ্রহ হিসেবে ছিল মূসার কিতাব। এ-কিতাবেরই সমর্থক, আরবি ভাষায়। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে এ সতর্ক করে আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।

(সূরা আহ্কাফ, আয়াত: ১২)

আবার এক খানে তিনি এইভাবে কথা বলেছেন যে, এই কোরআন যদি আরবি ভাষায় নাযিল না হয়ে অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো, তাহলে আরবি ভাষীরা, অর্থাৎ রসুল (সঃ) যাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং যাদের মধ্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল তারা, এই অভিযোগ করতেন - এই ভাষাটি আমরা বুঝি না, সুতরাং এই বাণী আমাদের ওপর কোনো কাজ করবে না। কোরআনের আয়াত দেখি তাহলে। আয়াতটি কমপক্ষে পাঁচবার পড়ুন:

আমি যদি আজমি (অ-আরবি) ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল না কেন? (কী আশ্চর্য, ভাষা) আজমি আর

(রসূল) আরবীয়! বলো, 'বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা কানে শুনতে পায় না আর (চোখে) অন্ধ। তাদেরকে যেন বহুদূর হতে ডাকা হচ্ছে।

(সূরা হা-মিম-সিজদা, আয়াত: ৪৪)

আমি তো তোমার ভাষায় এ (কোরআন) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানিদেরকে সুসংবাদ দিতে পার ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।

(সূরা মরিয়াম, আয়াত: ৯৭)

সচরাচর এভাবেই আমাদের অন্তর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে থাকে যে, আয়াতটি অতি সাধারণ কথা বলেছে। এতে কোনো লুকানো কথা নেই। এবং এর মধ্যে এমন কিছু নেই যার আলোকে আমরা একটি অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাই কোরআন পাঠ করার সময়ে তার যে অংশ আমাদের চোখে ভাসে, অধিকাংশ সময়ে শুধু ঐ অংশগুলিই আমাদের মনে প্রতিফলিত হয়, এবং তার ভেতরে প্রবেশ করা অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না: এ কারণে যে অনেকেই তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য প্রস্তুত নয়। এবং এ কারণেও যে, কোরআনকে মোটামুটিভাবে বুঝতে হলে মনটাকে খোলা রাখতে হয় - নিজের সিদ্ধান্তের কবল থেকে অন্তরকে রক্ষা করতে হয়। যা হোক, এই আয়াতটি থেকে আমরা কি নতুন কিছু জানতে পারি? আবার প্রশ্ন করি - এ আয়াতটি থেকে মানুষের মন এবং ভাষার সম্পর্ক সম্পর্কে আমরা কি নতুন কিছু জানতে পারি?

একটু খেয়াল করুন: আল্লাহ বলেছেন - যদি এই কোরআন আরবি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো ...। এই পর্যন্ত থেমে গিয়েও আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, কোরআন এমন জিনিষ যা

শুধু আরবি নয়, যে কোনো ভাষায় নাযিল করা যেত। তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, নাযিল হওয়ার আগে তা কোনো বিশেষ ভাষা রূপে সংরক্ষিত ছিল না। অথচ কোরআন নিজেই একটি ভাষা। তাহলে এ থেকে কী বোঝা যায়? আসলে কোরআন কোনো ভাষা নয় - এই বিষয়টিকে বুঝতে হবে। কোরআনে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা মানুষেরই ভাষা। আরবি যেমন মানুষের ভাষা - প্রাকৃতিক নিয়মে তার বিবর্তন ঘটেছে; প্রাকৃতিক নিয়মে তার পরিবর্ধন, পরিমার্জন সবকিছু ঘটছে, তেমনি পৃথিবীর সবগুলি ভাষায়ও একই প্রক্রিয়ায় বিবর্তন ঘটে, এবং এই ভাষাগুলি পূর্বনির্ধারিত হোক বা না হোক সে বিতর্কে না গিয়ে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি ভাষার নির্মাণে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এই মুহূর্তে আমি যদি আমার ভাষারীতি পরিবর্তন ক'রে অন্য একটি রীতি গ্রহণ করতে চাই, তাও আমার দ্বারা সম্ভব, যদি আমি একটু মেধাবী, চিন্তাশীল এবং সাধনাপ্রবণ হই।

নাযিল হওয়ার আগে কোরআন কোনো ভাষায় সমর্পিত হয়নি। তবুও তা ছিল একটি বাণী। এখানে আমরা বাণী এবং ভাষার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করছি। এই পার্থক্য কোনো ভাষার মধ্যে আগে থেকে না থাকলেও বাস্তবতার আলোকে আমাদেরকেই এই পার্থক্য সৃষ্টি করতে হচ্ছে। বাণীকে আমরা বলি আটারেন্স (utterance)। ভাষাতত্ত্বে আটারেন্স, ওয়ার্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে, কারণ এগুলোর ইঙ্গিত ভিন্ন। আটারেন্স অর্থ হলো উচ্চারণ। উচ্চারণ অর্থ হলো মনের ভেতরের বাস্তবতার প্রকাশ, যা যে মুহূর্তে উচ্চারিত হচ্ছে, ঐ মুহূর্তে বিশেষ অর্থ বহন করছে। আমি যদি এই মুহূর্তে চিৎকার ক'রে উঠি, তাহলে আমার কাছে যদি কেউ থাকেন, তিনি বুঝতে পারবেন আমি কেন চিৎকার করছি। বাহ্যিক কোনো স্পষ্ট কারণ না থাকলেও আমার মুখের দিকে তাকিয়েও অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যাবে আমি কেন চিৎকার

করেছি। অর্থাৎ আমার চিৎকার সম্পর্কে একটি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা এই পরিস্থিতি থেকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার এই চিৎকারকে যদি রেকর্ড করা হয়, এবং অন্যত্র সেই রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়, তখন এই চিৎকারের অর্থ এবং তাৎপর্য কী, তা হয়তো কেউই বুঝতে পারবে না। সুতরাং আমার চিৎকার যদি হয় একটি আটারেন্স বা উচ্চারণ, তাহলে আমাদেরকে এই উচ্চারণের অর্থ খুঁজতে হবে তা কার মধ্য দিয়ে কোথায় কখন সংগঠিত হয়েছিল, সেই স্থান-কাল-পাত্রের সম্মিলিত মাত্রাগুলির মধ্যে। একই বাক্য যদি সারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়, তাহলে বাক্য অভিন্ন বটে, কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন। কারণ প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব উদ্দেশ্যে নিজস্ব অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়ে তা উচ্চারণ করবে। ফলে তার ইমপ্লিকেশন বা ভবিষ্যৎ তাৎপর্যও ভিন্ন হবে। এভাবে কোরআন হলো আল্লাহর নিজস্ব উচ্চারণ, যা ভাষায় সমর্পিত হওয়ার আগেও উচ্চারণ আকারেই ছিল, কিন্তু সেই উচ্চারণ ভাষা-নির্ভর ছিল না, সেই উচ্চারণ ছিল তাঁর ইচ্ছা এবং স্বভাবের প্রকাশ। তাঁর স্বভাব মানেই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা মানেই তাঁর স্বভাব। এবং তাঁর ইচ্ছা মানেই বাস্তবতার ভাষা। আল্লাহ বলেছেন যে তার ইচ্ছাই বাস্তবতা। তিনি এও বলেছেন যে, ভাষাই বাস্তবতা। সুতরাং তাঁর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত একটি উচ্চারণ আগে থেকেই সংরক্ষিত ছিল। সেই উচ্চারণের ভাষা কী - সে প্রশ্ন কখনোই অর্থপূর্ণ হবে না, কারণ আমরা আগেই জেনে ফেলেছি যে, সেই উচ্চারণের অস্তিত্ব ছিল ভাষারও আগে। সেই উচ্চারণ কি কোনো চিন্তা? যদি বলি যে তা একটি চিন্তা, তাহলেও খুব বেশি ভুল নাও হতে পারে। কিন্তু তা আমাদের চিন্তার মতো নয়, আল্লাহর ইচ্ছা এবং পরিকল্পনার সঞ্চিত রূপ ব'লেই তাকে আমরা চিন্তা বলতে পারি।

আল্লাহ যেহেতু এক, সেহেতু তাঁর উচ্চারণও অনন্য - অন্য যে-কোনো সৃষ্ট জীবের উচ্চারণ থেকে আলাদা। তিনি চিরস্থায়ী ব'লে তাঁর উচ্চারণও তাই।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলোঃ ভাষা ছাড়া কি আদৌ চিন্তা করা সম্ভব? গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাদের মধ্যে ভাষা বিকশিত হয়নি, যেমন বোবা ও বধির, তারা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতেও সক্ষম নয়। অন্তরে ভাষার স্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার বিভিন্ন দরজা খুলে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভাষাবিহীন নীরব চিন্তন সম্ভব নয়। চি্তার প্রবাহ ঘটে ভাষার কাঠামো অনুযায়ী, শব্দগুচ্ছ অনুযায়ী নয়। এই কাঠামো প্রতীক বা শব্দ থেকে আলাদা। আমরা চিন্তার সময়ে যখন ভাষাকে ব্যবহার করি, তখন চিন্তার মধ্যে কমপক্ষে দু'টি স্রোত প্রবাহিত হয় - একটি হলো প্রতীক বা ভাষার প্রবাহ এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক, অন্যটি হলো প্রতিটি প্রতীক যে অর্থকে নির্দেশ করছে তার প্রবাহ। কল্পনা করুন যে একটি শব্দ বাতাসে ভাসছে। শব্দটি হলো 'মা'। এই শব্দটির পিছনে তার একটি ছায়াও ভাসছে। এভাবে কল্পনা করলে আমরা শব্দটিকে প্রতীক বা শব্দ এবং ছায়াটিকে তার অর্থ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। মূল জিনিষটিকে অপসারণ করলে ছায়ার কোনো অস্তিত্ব থাকে না এ কথা সত্য, কিন্তু আমাদের মনের ক্ষেত্রে বিষয়টি সত্য নয়। মন থেকে আমরা যদি সব শব্দগুলো মুছে ফেলতে পারতাম, এবং শুধু থাকতো সেগুলোর ছায়া, তাহলে নীরব কোলাহলমুক্ত একটি চিন্তার উপায় আমরা পেয়ে যেতাম, এবং এই চিন্তা আমাদেরকে এবং আমাদের চিন্তা ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডকে ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে রাখতো না। কোরআনের ভাষা উঠে এসেছে এই স্তরেরও অসীম অনেক গভীর থেকে, এবং কোরআনের ভাষা প্রথমত আমাদের মনে অর্থের বা তাৎপর্যের ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর আঘাত করে, পরবর্তীতে তা আমাদের সচেতন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে পরিচালিত করে।

এই বিষয়টিও প্রমাণ করা সম্ভব তবে এই মুহূর্তে আমরা সেই প্রমাণের মধ্যে প্রবেশ করব না। আমরা এই পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি তা থেকে খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমাদের মানসিক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ

ঘটে ভাষার মাধ্যমে, আর প্রকাশ ভাষার মাধ্যমে ঘটে ব'লেই সচরাচর আমরা মনে করি যে, বাহ্যিক জগৎ থেকে যখন আমরা তথ্য গ্রহণ করি, তখন তাও করি ভাষার মাধ্যমে। আসলে ভাষার মাধ্যমে আমারা শুধু তথ্য প্রকাশই করি, তথ্য গ্রহণ ভাষার মাধ্যমে করি না। তা ঘটে অন্য কায়দায় - ভাষাবিহীন উপায়ে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয় মানে কিন্তু মন নয়। সেগুলি দ্বারা গৃহীত তথ্যকে মন গ্রহণ করে ভাষার মাধ্যমে। মনের সেই ভাষা দাঁড়িয়ে আছে মনের কাঠামোর ওপর। এই কাঠামোই মানবের আদি ভাষা, যা প্রতীকের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা তার যোগ্যতা বলে প্রতীককে সৃষ্টি ক'রে নেয় - যদিও সে কাজ ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধ'রে। তবে ভাষা সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা আমার কথা, বিজ্ঞান এখনও এমন কিছু বলেনি। তাই কেউ ইচ্ছে করলে এই আলোচজনা অগ্রাহ্য করতে পারেন:

শব্দের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ সহজ হয়। যেমন আমি ভাত খাব - এই কথাটা দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা বোঝাতে পারব, এবং সবাই তা বুঝতে পারবে। আমি বোঝাতে পারলাম কিন্তু অন্য কেউ তা বুঝতে পারল না, এ রকম পরিস্থিতি হলে বুঝতে হবে যে সেখানে ভাষা কাজ করছে না। কিংবা ভাষা কাজ করলেও উভয়ের ভাষা ভিন্ন। ফলে সেখানে উভয়ের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ হচ্ছে না। যোগাযোগ হলো অর্থের স্তর থেকে এবং ভাষা পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করে প্রকাশের স্তরে। আমরা আমাদের ভাষার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত ক'রে রাখতে পারি। পৃথিবীর শুরু থেকে এই পর্যন্ত মানুষ যত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তার যা কিছু লিখিত কিংবা কথিত রূপে রয়ে গেছে, তা সব ভাষার মধ্যে সঞ্চিত থাকার কারণেই আমাদের কাছে আসতে পেরেছে। সুতরাং ভাষা হলো তথ্য সঞ্চয়ের মহাজাগতিক উপায়। যেই মাত্র আপনি কোনো একটি নতুন ধারণা অন্তরের মধ্যে দেখতে পেলেন,

এবং আপনার মাথায় কোনো নতুন একটি আইডিয়া এল যা আগে কখনও কারো মাথায় আসেনি, কিংবা অন্তত তা কারো মাথায় এসেছে কি না তা জানার জন্যে আমরা সেই চিন্তার কোনো প্রকাশিত রূপকে দেখিনি, তখই যদি একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার ক'রে আপনি তাকে নির্দেশ করেন, তাহলে সেই শব্দের মধ্যেই আইডিয়াটি আশ্রয় লাভ করবে। চিন্তা যখন একটি বিশেষ পরিকল্পনা কিংবা চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে, তখন তা মনে রাখা খুবই দরকার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোনো না কোনো কারণে আমরা তা ভুলে যাই। ভাষা আমাদেরকে চিন্ত াগুলিকে সঞ্চয় করতে সাহায্য করে। এই সঞ্চয় মানে লিখে রাখা বা কম্পিউটরে সঞ্চিত ক'রে রাখা নয়। এই সঞ্চয় মানে আরও মৌলিক কিছু। কিভাবে তা ঘটে? যখনই আপনি নতুন একটি আইডিয়া লাভ করলেন, এবং তার একটি নাম দিলেন, তখনই তা সঞ্চিত হয়ে গেল। আপনার মস্তিষ্কে তা থাক বা না থাক, ঐ নামের মধ্যেই আপনার আইডিয়াটি সঞ্চিত হয়ে গেল। অর্থাৎ আমাদের ভাষার প্রতিটি শব্দ কমপক্ষে এক একটি অর্থের সঞ্চয়। সেই সঞ্চয় লিখিত থাক বা কম্পিউটরে সঞ্চিত থাক, সেটা ভিন্ন কথা। এ হলো তথ্য বা মনের ভাব সঞ্চয়ের মহাজাগতিক উপায়।

কোরআনের বাণীর প্রতিটি শব্দই এমন কিছু অর্থকে নির্দেশ করে, যাকে শুধু অর্থ হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে, বরং তা-ই বাস্তবতা। সেই বাস্তবতার সঙ্গেই আমাদের প্রতিনিয়ত আলাপ হচ্ছে, বিশেষ ক'রে যখন আমরা কোরআন পাঠ করি বা শ্রবণ করি, তখন সেই বাস্তবতা থেকে আমাদের অন্তরে আদেশ আপতিত হয়, বা তা থেকেই আমাদের অন্তরে তথ্য দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি উঠে আসে, যদিও সচেতনভাবে আমরা অনেক সময়ে বুঝতে পারি না যে তা ঘটছে একটি বাস্তবতার স্ত র থেকে, ভাষার স্তর থেকে নয়। কোরআনের বাণী আমাদের সাথে কেবল অর্থ দিয়ে যোগাযোগ করে না - বক্তব্য, রীতি, যুক্তি-প্রবাহ,

ছন্দ, পৌনঃপুনিকতা ইত্যাদি অনেক উপায়ে যোগাযোগ করে। তা আমাদের অস্তিত্বের সব স্তরের সাথে ক্রিয়া করে - শুধু বোধগম্যতার স্তরে নয়। এই বাস্তবতার স্তরে ভাষার সীমাবদ্ধতাগুলি নেই। ভাষার মাধ্যমে চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি করার কারণে আমাদের অন্তরে উক্ত চিন্তা, কামনা ইত্যাদি বিশেষ আকারে সঞ্চিত থাকে, নামাজে দাঁড়ালে যে সঞ্চয় আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। কারণ আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার মতো ব্যবহার করেছি এবং তা এক পর্যায়ে আমার এবং সত্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা বলছি, এমন কি কোনো উপায় আছে যে ভাবে চিন্তা করলে ভাষার প্রতীকগুলিকে মুছে দিয়েও শুধুমাত্র তার অর্থের ধ্বনির বা দৃশ্যমানতার দিকে খেয়াল ক'রে চিন্তা করা যাবে? এবং ফলে মনের মধ্যে কোনো চিন্তার জট কিংবা ওলট-পালটকারী প্রবাহ সৃষ্টি হবে না? ভাষা মনকে প্রকাশ করে বটে, তবে যখন কেউ তার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করছে, তখন তার মুখের ভাষাকে তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করছে। কিন্তু যে শুনছে, সে কিন্তু ভাষাকে গ্রহণ করছে না, সে প্রথমে গ্রহণ করছে অর্থকে। আমরা এর আগে একটি উদাহরণে দেখেছি যে একটি ব্যক্তি রান্না ঘরে ছিলেন তাকে আমরা একটি প্রশ্ন করেছিলাম। সেই প্রশ্নটিকে আমরা সংকেতের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে আমাদের জন্য তা বোঝা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই আমরা বলেছিলাম যে তিনি রান্না ঘরে আছেন, তখনই প্রশ্নটির পূর্ণাঙ্গ রূপ আমাদের অন্তরে ভেসে উঠল। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শব্দ বা ভাষার উপাদানগুলি অর্থ লাভ করে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট বা কনটেক্স্ট থেকে, অন্য কোনো উপায়ে নয়।

প্রতিটি শব্দের রয়েছে দুই স্তরের অর্থ। প্রথমত সেই শব্দটির যে অর্থ অভিধানে বা ডিকশনারিতে পাওয়া যায় সেটিকে আমরা বিবেচনা করি। একে বলা হয় ডিনোটেশন বা আভিধানিক অর্থ। যেমন 'মা'। এই

শব্দটি দিয়ে একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। সেই শব্দটিই এই ব্যক্তির মূল ইঙ্গিত এবং অর্থ। তবে যখনই 'মা' শব্দটিকে উচ্চারণ করা হয়, তখন তা আমাদের মস্তিষ্কে অন্যান্য কিছুর ধারণা বা অভিজ্ঞতার এবং এমনকি অনুভূতিকে জাগ্রত ক'রে তোলে। যেমন স্নেহ, ভালোবাসা, যত্ন, আশ্রয় ইত্যাদি। মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় এই যে অর্থপুঞ্জ জেগে ওঠে, এদেরকে এক সঙ্গে বলা হয় কনোটেইশন বা লাক্ষণিক অর্থ। আমরা সচরাচর চিন্তা করার সময়ে ভাষা ব্যবহার করি। অমরা বলছি না যে এই ভাষাকে ত্যাগ করতে হবে। তাহলে চিন্তা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। বরং আমরা বলছি এই ভাষার প্রতীকী রূপটিকে বেশি প্রাধান্য না দিয়ে আমরা যদি তার কনোটেশন বা লাক্ষণিক অর্থকে বেশি প্রাধান্য দেই, তাহলে আমাদের চিন্তার মধ্যে ভাষার মৌমাছিগুলো অযথা গুণগুণ ক'রে উঠবে না। আমাদের নামাজে, ধ্যানে, গভীর চিন্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এই অভ্যাসটি কিভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে? আমরা এতক্ষণে যে আলোচনা করেছি তা থেকে যে অভিজ্ঞতা বা প্রবণতা আমাদের জাগ্রত হয়েছে, তা দিয়েও এই উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে। তবে এই বিষয়টি এত বিস্ত ারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন যে এই বইতে তার জায়গা হবে না। এই বিষয়টি নিয়ে ইনশাল্লাহ্ আমরা তা আলোচনা করব ***শব্দের পেছনে বাস্তবতা*** নামক বইটিতে।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে: শুধুমাত্র কান এবং চোখের মাধ্যমে বাইরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা যখন উচ্চারিত হয়, তখন আমরা তা শুনি। এভাবে আমরা কানের মাধ্যমে ভাষাকে ব্যবহার ক'রে যোগাযোগ স্থাপন করি। যখন তা লিখিত অবস্থায় থাকে, তখন তা আমরা পড়ি। এভাবে চোখের মাধ্যমে ভাষা আমাদেরকে বাহ্যিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। কিন্তু আমি যখন চিন্তা করছি তখন তো যোগাযোগ করছি নিজের সঙ্গে, বাইরে

কারোর সঙ্গে নয়। তাহলে কেন আমি ভাষার বাহ্যিক স্তরটিকে ব্যবহার করব? এভাবে নিজেকে প্রশ্ন করলে দেখা যায় যে আমরা আসলে চেষ্টা করলে আমাদের ভ্রান্তিগুলো ধরতে পারি। ভাষার উচ্ছিষ্ট আমাদের মনের মধ্যে জঞ্জাল সৃষ্টি করে। তার কারণ হলো এই যে, আমরা ভাষাকে স্বেচ্ছাচারিতার মতো ব্যবহার করি এবং আমাদের ভাষা এবং চিন্তার মাঝে যে ঘনিষ্ট সম্পর্কটি রয়েছে তা অধিকাংশ সময়ে আমরা নষ্ট ক'রে ফেলি। ফলে কার্ল মার্কস এর সেই আবিষ্কারটিও আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে যায়। তিনি বলেছিলেন যে বিচ্ছিন্নকরণ বা এলিয়েনেশন একটি কঠিন ব্যাধি। শ্রম থেকে শ্রমিককে আলাদা ক'রে ফেলা হয়েছে। ফলে তার শ্রমকে ক্রয় করতে সুবিধা হয়েছে, এবং শ্রমিক যে একটি ব্যক্তি মানুষ, তার দুঃখ-কষ্ট, শখ-আহ্লাদ, প্রয়োজন ইত্যাদি রয়েছে - সে সবের প্রতি আমাদের নজর না দিলেও চলে। আমাদের অর্থনীতিগুলো গঠিত হয়েছে শ্রমকে ঘিরে, শ্রমিককে ঘিরে নয়। কার্ল মার্কস্ এর সমালোচনা কারণে জগতের অনেক উপকার হয়েছিল, যদিও তিনি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিশাল বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন - তা হলো ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার অংশে। কিন্তু অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তিনি অনেক সুন্দর কিছু জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন। অনুযায়ী তিনি একটি সিস্টেম দিয়েছিলেন। তবে সেই সিস্টেমটিও ছিল ত্রুটিতে ভরপুর। যাই হোক, মানবজাতির একজন সদস্যের মাথায় আল্লাহ কিছু মূল্যবান জ্ঞান দান করেছেন, কিছু মূল্যবান জাগ্রত ভাব দান করেছেন, তা আমাদেরকে ব্যবহার করতেই হবে। সেই সম্পত্তি কারো ব্যক্তিগত নয়। জ্ঞান গোটা মানবজাতির সম্পত্তি। এই কারণে তার প্রসঙ্গটি টেনে আনলাম।

আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে - ভাষা এবং চিন্তার মধ্যে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছেদ ঘ'টে গেছে। ফলে আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন ভাষা হয় এক রকমের, আমাদের মনের আকুতি হয় অন্য রকমের। ভাষার

সাথে সাথে আমাদের মন সহাবস্থানে থাকতে চায় না। কারণ এর আগে আমরা স্বেচ্ছাচারীর মতো আমাদের ভাষাকে ব্যবহার ক'রে ফেলেছি। উদ্দেশ্য এবং ভাষার মধ্যে যখন কোনো পার্থক্য থাকে না, প্রয়োগ বা ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া, তখন আমাদের ভাষাই হয় সত্য। যেভাবে আমরা আল্লাহর বাণীকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছি, ঠিক সেই ভাবে, সেই অর্থে। তবে আমাদের ভাষা তখন এ কারণে সত্য নয় যে, আমরা সত্যকে নির্মাণ করেছি, তৈরি করেছি, বরং এ কারণে যে, আমরা আমাদের ভাষার মাধ্যমে সত্য এবং আমাদের অন্তরের মাঝে কোনো বিভেদ সৃষ্টি ক'রে রাখিনি।

একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। আমি বাংলাদেশের কথাই বলি। এখানে অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। মসজিদের সংখ্যা পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এত বেশি আছে কি না, আমার জানা নেই। কারণ আমি মূলত তথ্য-প্রধান চিন্তাগুলি করি না। সেই সুযোগই আমার হয় না। আমি চিন্তা করি অভিজ্ঞতা-প্রধান এবং তত্ত্ব-প্রধান। তথ্য তো কম্পিউটারের মধ্যেই সঞ্চিত আছে। কোনো না কোনো বই-পুস্তকে সঞ্চিত আছে। সেই সঞ্চয় মানুষের উপকার করে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঞ্চয় যদি বই-পুস্তকে বা কম্পিউটারেই রয়ে যায়, আমাদের স্বভাব, আচরণ, বিশ্বাস আকিদার মধ্যে প্রকাশ না পায়, তাহলে তা দিয়ে কী লাভ? এ কারণে আমি সব সময়ে তথ্যের বিপরীতে অন্য কোনো বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, এবং আমি মনে করি এভাবেই আমি আমার সাধ্য মতো মানুষের সেবা করতে পারব। যারা তথ্য-নির্ভর বা তথ্য ব্যবহার করতে খুব বেশি পছন্দ করেন, তারা তাদের কাজ করবেন তাদের উপায়ে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

যা হোক, আমরা বলছিলাম আমাদের দেশের মুসলমানদের ভাষা সম্পর্কিত আচরণবিধি এবং অভ্যাস নিয়ে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ

মুসলমান। এবং এদেশে নামাজ, মসজিদ, রোজা কোরবানি কোনো কিছুরই অভাব নেই। অথচ ঠাট্টার সময়ে, রাগ প্রকাশের সময়ে, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সময়ে, প্রতিশোধ নেয়ার সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষকে কুৎসিত ভাষা উচ্চারণ করে। ভাষার এই একটি দিক সত্যিই রহস্যময়। মানুষ যখন রেগে যায়, আবেগাক্রান্ত হয়, তখন সে গালিগালাজপূর্ণ কিছু শব্দের আশ্রয় নেয়। এবং সারা পৃথিবীতে সব ভাষার ক্ষেত্রেই এই কথাগুলি সত্য যে, গালিগালাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি বিশেষ কিছু বিষয়কে নির্দেশ করে, যা সচরাচর আমরা কখনোই প্রকাশ করতে চাই না। যেমন আমাদের দেশে 'মা' তুলে গাল দেয়ার প্রথাটা সম্ভবত সার্বজনীন হয়ে গেছে। এই জাতীয় অভ্যাস হলো ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম কূপমণ্ডুকতা। কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে রাতে কি করেছে তাও সকালে এসে রাস্তায় কারো সঙ্গে বলতে যায় না। সেটা বলাও ঠিক নয়। কিন্তু কার মায়ের সঙ্গে রাগবশত বা ক্ষোভের দ্বারা তাড়িত হয়ে কী করতে মন চেয়েছে, কিংবা কোন কথাটি প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়া যাবে, তাও আমরা নির্লজ্জের মতো প্রকাশ করতে দেই। ভাষা ব্যবহারের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি আসলে মানুষের ভাষাকে নষ্ট করে। প্রতিটি ভাষাতেই এভাবে সেই ভাষার গালিগালাজের উপায়গুলি সঞ্চিত হয়ে আছে। সেগুলিকে পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, এক দিকে তার কিছু দার্শনিক রহস্য রয়েছে, যা এই মুহূর্তে আলোচনা করা সম্ভব নয়, এবং অন্য দিকে তার পেছনে কাজ করছে আমাদের অভদ্রতা, অজ্ঞতা, অপবিত্রতা, এবং গাফিলতি। হাসি-ঠাট্টার ছলেও অনেকে একে অপরকে যেভাবে সম্বোধন করে এবং যে কুৎসিত ভাষার মাধ্যমে অনেকে নিজেদের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তা তাদের চিন্তায় প্রভাব ফেলে, এবং তার দ্বারা তাদের অন্তঃকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুখে ভাষার এই স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ ব্যবহার আমাদের প্রার্থনাকেও প্রভাবিত করে। ফলে সেই মুখ দিয়ে প্রার্থনা করলে,

উপাসনা করলে, তাতে যে পূর্ণাঙ্গ ফল পাওয়া যাবে না, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

ভাষা সম্বন্ধে আল্লাহ্ আমাদের আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন সত্য কথা বলি। আমরা যেন সুন্দর ভাষা ব্যবহার করি। আমরা যেন অসার কার্যকলাপ এবং বাক্য থেকে দূরে থাকি। এই তিনটি বিষয় যদি আমরা না মানতে পারি, তাহলে আমাদের ভাষা আমাদের চিন্তাকে এমনভাবে জড়িয়ে রাখবে, যেমন আমাদের সর্দি-কাশি আমাদের নাককে জড়িয়ে রাখে। কোনোভাবেই তা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই রোগ থেকে আমরা রেহাই পাই।

সুতরাং আসুন আমরা আমাদের ভাষাকে পরিশোধিত করি। এবং তখন আমাদের ভাষা আমাদের অন্তরকে আরও বিশুদ্ধ করবে। কারণ বাইরের জগৎ থেকে আমরা যে তথ্য গ্রহণ করি, তার সবকিছুরই প্রকাশ ঘটে মনের মধ্যে, ভাষার মাধ্যমে। ফলে আমাদের ভাষা হলো আমাদের জন্য এমন অস্ত্র, যাকে ব্যবহার ক'রে আমরাই আমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারি। একমাত্র ভাষাই বাইরে থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাইরে আসা যাওয়া করছে। ফলত ভাষা ব্যবহার এবং নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে এবং সে ব্যাপারে সংযত হয়ে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও সুন্দর ক'রে তুলতে পারি।

((অন্ধত্ব ও দৃষ্টি))

দেখতে পারার অযোগ্যতাই অন্ধত্ব। বিষয়টি এই অর্থে বোঝা খুবই সহজ। কিন্তু অন্ধত্ব যখন দৃষ্টিভঙ্গিতে, অনুভূতিতে এবং এমনকি জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করার অক্ষমতা হিসেবে প্রকাশ পায়, তখন তা একটা যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয়। আমরা সচরাচর কোনো যোগ্যতার অনুপস্থিতিকে কোনো যোগ্যতা বলি না। যেমন বুদ্ধিকে আমরা একটি যোগ্যতা বলি, কিন্তু নির্বুদ্ধিতাকে যোগ্যতা বলি না। কিন্তু আসলে নির্বুদ্ধিতাও একটি যোগ্যতা, যদি তা একটি বিশেষ স্তরকে অতিক্রম করে। এবং আল্লাহ পবিত্র কোরআনে অনেক ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যকে যোগ্যতা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। আমরা তাহলে কিছু আয়াত দেখি:

অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসী আরবরা বড় বেশি পোক্ত। আর আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার (ন্যায়নীতির) সীমারেখা না শেখার ***যোগ্যতা*** *এদের বেশি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।*

(সূরা তওবা; আয়াত ৯৭)

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে যোগ্যতার অভাবও এক ধরনের যোগ্যতা, যদি সেই অভাবকে পুঁজি ক'রে কেউ আনন্দ কুড়াতে চায়। যেহেতু এ কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, সেহেতু এতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন করা খুবই জরুরিঃ যোগ্যতার অভাব, অর্থাৎ কোনো অযোগ্যতা, কোন অর্থে যোগ্যতা? এবং কেন তাকে যোগ্যতা বলা হচ্ছে?

আমরা যখন কোনো কাজ করাকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করি, এবং সেই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করি, তখন সেই দিকে আমাদের শক্তি ব্যয়িত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জায়গা থেকে মন উঠে আসে। ফলে মনের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয়, দিয়েই সেই কাজটি করার জন্য প্রবৃত্ত হই। সেই কাজটি ভালো হোক বা মন্দ হোক, সেই কাজের পেছনে একটি সীমার বাইরে যখন আমরা পরিশ্রম ক'রে ফেলি, তখন এমন এক পর্যায় চ'লে আসে, যখন সেই কাজটি না করাই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এর নাম অভ্যাস। অভ্যাস থেকে উঠে আসে নির্ভরশীলতা। এই জন্যে আল্লাহ কোরাআনে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ভালোকে ভালো হিসেবে গ্রহণ করবে, সুন্দরকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করবে, তার জন্য ভালো কাজের পথ সহজ হয়ে যাবে। এবং যে খারাপকে ভালো হিসেবে গ্রহণ করবে, তার জন্যে কঠোর পরিণামের পথ সহজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার জন্যে খারাপ কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। বারবার সে খারাপ কাজই করতে থাকবে। ভালো কাজ করাই তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। কারণ তার দেহ-মনের খারাপ কাজেই ব্যয় ক'রে ফেলেছে। সেখান থেকে সেই শক্তিকে ফিরিয়ে আনা খুব সহজ নয়।

তাই কেউ দান করলে, সাবধানি হলে ও যা ভালো তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুখকর পরিণামের পথ সহজ ক'রে দেব। আর কেউ ব্যয়কুণ্ঠ হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যা ভালো তা বর্জন করলে তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ ক'রে দেব এবং যখন তার পতন ঘটবে তখন ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। আর কাজ তো কেবল পথের নির্দেশ দেওয়া। আর আমিই (মালিক) ইহকাল ও পরকালের।

(সূরা লাইন, আয়াত: ৫-১৩)

এই বিষয়টি থার্মোডাইনমিক্সের দ্বিতীয় সূত্রে চমৎকারভাবে উল্লেখিত হয়েছে। একে আমরা বলতে এনট্রপি বা ক্ষয়। শক্তির এই ক্ষয়ের কারণে শক্তির ব্যবহার সর্বদা এক-মুখী। একটি বিশেষ পর্যায়ের পর আমাদের মনের অভিমুখিতা ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। যেমন আমি যদি এক নাগাড়ে কয়েক বছর ধ'রে একটি বিশেষ খারাপ কাজ করতেই থাকি, এবং তা আমার ভালো লাগার মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়, এবং সেই দিকে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাও নতুন ক'রে তৈরি হয়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে হঠাৎ ক'রে ফিরে আসাও আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। শুধু মানসিক অর্থে নয়, বাহ্যিক অর্থেও কথাটা সত্য। কারণ আমরা যখন কোনো খারাপ পথে যাই, তখন আর দশ জন কোনো না কোনোভাবে উপকৃত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ খারাপ কাজ করতে গিয়ে, নিজের খারাপ অবস্থানকে ধ'রে রাখতে গিয়ে, আমাকে কিছু শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সব ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। খারাপকে রক্ষা করতে গেলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। ভালোকে রক্ষা করতে গেলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ বলেছেঁন যে তিনি সাবধানীকে পছন্দ করেন। সাবধানীই আত্মরক্ষা করতে পারে, অন্য কেউ পারে না। এভাবে কোনো খারাপ কাজ থেকে আমরা দ্রুত স'রে আসতে পারি না, কারণ যদি আমরা স'রে আসি, তাহলে এতদিন

যারা ঐ খারাপের ওপর নির্ভর ক'রে জীবন-যাপন করেছিল বা আনন্দ পেয়েছিল, তারা আমাকে আসতে দেবে না, বা আমাকে ধ্বংস ক'রে দিতে চাইবে। সামাজিক এবং মানসিক উভয় অর্থেই এই প্রত্যাবর্তন খুবই কঠিন। ফলে আমরা যাই করতে পছন্দ করি, এবং সেই পছন্দের কারণে তার পেছনে যত শ্রম ও শক্তি ব্যয় করি, তা আমাদের জীবনে একটি সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে, এবং আমাদের দেহ-মনের শক্তির প্রবাহকে একটি বিশেষ দিকে চালিত করে। একে মনোবিজ্ঞানে বলা হয় কনডিশনিং বা অনুবর্তন।

কনডিশনিং আমাদের অভ্যাসকে তৈরি করে। কনডিশনিং না থাকলে আমাদের জীবন-যাপন সহজ হতো না। আমি এই মুহূর্তে যদি অজানা কোনো পথে চলতে যাই, এবং সেখানে যদি অন্ধকার বিরাজ করে, তাহলে আমার জন্য চলা খুবই কঠিন হবে। কিন্তু যারা ঐ পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, অন্ধকারে তাদের কোনো সমস্যা হবে না। তাদের কনডিশনিং হয়ে গেছে এবং অভ্যাসের মধ্যে তাদের গোটা অভিজ্ঞতা স্বয়ংক্রিয় হয়ে গেছে। কোথায় কিভাবে পা ফেলতে হবে, কোথায় সাবধানে চলতে হবে, সে ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি ডাটাবেজ তৈরি হয়ে গেছে। ফলে তাদের জন্য চলা খুবই সহজ হবে। কিন্তু আমি যদি সেই পথে চলতে যাই, তাহলে আমার পক্ষে চলা আদৌ সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এই কনডিশনিংই যে আমাদের জীবন সহজ করে তা বুঝতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে কাজগুলো করি, তার অধিকাংশকেই একটি বিশেষ ছকে ফেলা সম্ভব। ফলে আমরা সচরাচর সেই কাজই করতে চাই যা করা আমাদের জন্য সহজ, যেন আমাদের দেহ-মনে শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং বেশি শক্তি ব্যয়িত না হয়। কিন্তু সঠিক পথে চলতে গেলে আমাদেরকে অনেক সময়ে কঠিন পথটিকে

বেশি পছন্দ করতে হয়। তার কারণ বিগত জীবনে আমরা যে ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম, সেই ভ্রান্তির পেছনে আমাদের অনেক সময় ব্যয়িত হয়ে গেছে। ফলে এখন সঠিক পথে চলতে গেলে আমাদের তারও দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না। এই কারণে অধিকাংশ সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তির জন্য সঠিক পথে চলতে গেলে অতিরিক্ত শক্তি খরচ করার জন্য এবং বেশি পরিশ্রম করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়। তাই আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন যে তিনি আমাদেরকে দুটি পথ দেখিয়েছেন - একটি সোজা একটি কঠিন। এবং তিনি আমাদেরকে এই ব'লেও ভর্ৎসনা করছেন যে, আমরা তো কঠিন পথটি বেছে নিইনি। কঠিন পথটি বেছে না নিলে সত্যের পথে চলা সম্ভব নয়।

আর দুটো পথই কি আমি তাকে দেখাই নি? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি।

(সূরা বালাদ, আয়াত: ১০-১১)

যা হোক, আমরা কথা বলছিলাম অন্ধত্ব নিয়ে। অন্ধত্ব যখন অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়, তখন তা যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয়।

আর এই অর্থে অনেকেই সত্যকে না-দেখার জন্য উপযুক্ত।

সুতরাং আগে দৃষ্টি ঠিক করতে হবে। প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে - দৃষ্টি ব'লে আমি কী বুঝি? বাহ্যিক অর্থে সন্দেহাতীতভাবে দৃষ্টি মানে চোখের মাধ্যমে বাইরের জগৎ থেকে তথ্য গ্রহণের উপায়। এটি একটি যোগ্যতা। কিন্তু চোখের মাধ্যমে কোনো তথ্য আলোর সংকেত হিসেবে আমি গ্রহণ করলাম, আর সেই সাথে যদি অন্যান্য মানসিক ক্রিয়াকাণ্ড জড়িত না হয়ে পড়ে, তাহলে খুব সহজেই বলা যায় যে, চোখের কাজ হলো একটি ক্যামেরার মতো।

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি - ক্যামেরার কি দৃষ্টি রয়েছে? সে কি কিছু দেখে? ক্যামেরা কিছু দেখাতে পারে না, কেবল বাস্তবতার একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং চোখ দিয়ে জগৎ থেকে কোনো তথ্য গ্রহণ করা মানেই দেখা নয়। দেখা হলো সেই গৃহীত তথ্যকে অনুধাবন করার যোগ্যতা।

এখন আমরা আর একটি সূক্ষ্ম পর্যায়ে এসে থেমেছি। দেখার যোগ্যতা তো জন্মের থেকেই মানুষ পেয়ে থাকে। কিন্তু অনুধাবন করার যোগ্যতা সেটি আবার কী? তা কীভাবে লাভ করা যায়?

কোনো কিছু দেখে কখন বোঝা সম্ভব যে, যা দেখলাম তা ভালো না কি মন্দ, উপকারী না কি ক্ষতিকর, তখনই তা বোঝা সম্ভব। তখন সেই ভালো বা মন্দ উপকার বা ক্ষতি ইত্যাদির পর্যাপ্ত জ্ঞান মনের মধ্যে আগে থেকেই থাকে। মনের মধ্যে আগে থেকেই যদি সত্য থেকে মিথ্যা আলাদা করার এই যোগ্যতা থেকে থাকে, যা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হয়তো অর্জন করা হয়েছে, তাহলে সেই যোগ্যতাই মূলত দৃষ্টি। স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখা ব'লে যা বুঝি, এই দেখা তার চেয়ে অনেক গভীর। তবে সেই যোগ্যতা যার মধ্যে নেই, তার দৃষ্টিকেও দৃষ্টি বলা হচ্ছে। আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে, সেরূপ দৃষ্টিবান ব্যক্তি অন্ধ, কারণ তার চোখ অন্ধ নয়, তার অন্তর অন্ধ।

> *যে ইহলোকে অন্ধ সে পরলোকেও অন্ধ এবং আরও বেশি পথভ্রষ্ট।*
>
> *— সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত: ৭২*

> *দুটো দলের উপমা অন্ধ ও বধিরের, আরা যারা দেখতেও পায় ও শুনতেও পায়। তুলনায় দুটো কি সমান? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?*
>
> *(সূরা হুদ, আয়াত: ২৪)*

তাদের উপমা এমন এক ব্যক্তি যে আগুন জ্বেলে তার চারিদিক আলোকিত করে, তারপর আল্লাহ সেই আলো সরিয়ে নেন ও তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দেন আর তারা কিছুতেই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭-১৮)

আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপমা যেন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যা হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না-তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭১)

আর তারা মনে করেছিল যে তাদের কোনো শাস্তি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। তার পরও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির রয়ে গিয়েছিল। আর তারা যা করে আল্লাহ তো তা দেখেন।

(সূরা মায়িদা, আয়াত: ৭১)

বলো, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি জনি না। তোমাদেরকে এ-ও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তা-ই অনুসরণ করি।' বলো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?'

(সূরা আনআম, আয়াত: ৫০)

তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো এসেছে। যে-কেউ তা লক্ষ করবে তা তার নিজের জন্যই করবে, আর কেউ লক্ষ না করলে তাও তার নিজের জন্যই, আর আমি তোমাদের রক্ষক নই।

(সূরা আনআম, আয়াত: ১০৪)

তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, আর যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত:৬৪)

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও।

(সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৩)

যারা বলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো বিশ্বাস করেছি; অতএব তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করো এবং নরকের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।'

(সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ১৬)

তোমরা প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে যে সত্য বলে জানে সে আর যে (জেনেও) অন্ধ সে কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

(সূরা রা'দ, আয়াত: ১৯)

এখন আমরা আবারও সেই মৌলিক প্রশ্নে ফিরে যাই। দেখা মানে কী? দেখা মানে হলো বিচার করা। সেই বিচারের আগে কোনো সিদ্ধান্ত থাকবে না। সেই বিচার থেকে সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই উঠে আসবে। আর বিচার থেকে যা উঠে আসে তাকে সিদ্ধান্ত বলা যায় না। তাকে বলা যায় উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্কার।

দেখা মানে আবিষ্কার করা। যা আগে থেকেই ছিল তার ওপর থেকে পর্দা স'রে যাওয়ার কারণে তার মুখোমুখি হতে পারা। কিসের পর্দা স'রে যাবে? পর্দাটা কী দিয়ে তৈরি? এই পর্দা হলো আমাদেরই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত অনুভূতির অস্পষ্টতা। এই পর্দা আর কিছুই নয়, তা আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতাকে ধ্বংস ক'রে দেয়।

এইভাবে যার কান আছে সে-ই যে শ্রবণ করার উপযুক্ত, তাও নয়। বরং সেই শ্রবণ করার উপযুক্ত, যে কান দিয়ে শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে। গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত মন না থাকলে দেখে এবং শুনে কোনোই লাভ নেই। কারণ আমরা যে বিষয়ে কিছু দেখি, সেই বিষয়েই শুনি। বাস্তবতার একটি দিকের তথ্য আমরা দৃষ্টির মাধ্যমে লাভ করি, এবং অন্য দিকের তথ্য আমরা শ্রবণের মাধ্যমে লাভ করি। এ ছাড়াও এই দুইটির শক্তির মধ্যে আরও কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, যা এই মুহূর্তে আমরা আলোচনা করতে চাই না।

শ্রবণ এবং শ্রবণ-ক্ষমতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ অত্যন্ত চমৎকার কিছু তথ্য আমাদেরকে দান করেছেন। তিনি যা বলেছেন তা পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, শ্রবণ সেই করতে পারে যে অনুগত। আপনি আমাকে কিছু বললেন। আপনি যা বললেন তা যদি কোনো আদেশ বা নিষেধ হয়ে থাকে, তাহলে তা আমার কানে প্রবেশ করা সত্ত্বেও এমনও হতে পারে যে, আমি তা

শুনতে পাইনি। কারণ, প্রথমত আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আপনার আদেশ বা নিষেধ এর সঙ্গে লড়াই করবে। সেই লড়াইয়ে আপনার আদেশ যদি জয়যুক্ত হয়, তাহলেই আমি তা শ্রবণ করতে সক্ষম হব। তার সুফল গ্রহণ করতে সক্ষম হব। নইলে তা আমার অন্তরে প্রবেশই করবে না। আমার যুক্তিতর্কের দেয়ালের বাইরেই রয়ে যাবে।

আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মনকে প্রস্তুত করলাম। এখন আমরা দৃষ্টি সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলি নিজেদেরকে করতে পারি। এবং এই প্রশ্নগুলি করার পর কোনো উত্তর সন্ধান করার কোনো প্রয়োজন হবে না। কারণ এই প্রশ্নগুলি অন্তরের এমন অঞ্চলে গিয়ে আঘাত করবে, যেখানে এর উত্তর রয়েছে। এই উত্তরগুলি যদি আমাদের অন্তরে প্রশ্ন আকারেও রয়ে যায়, তবুও তা উত্তর হিসেবেই কাজ করবে। অন্তরের ব্যাপারটি এমন যে, সে ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি করতে পারাই যথেষ্ট। ঈসা (আ.) বলেছিলেন - তোমরা আঘাত কর; দরজা খোলা হবে। অর্থাৎ আঘাত না করলে দরজা খোলা হবে না। মনকে সব দিক থেকে প্রস্তুত করার পর মনের দরজায় আঘাত করার সঠিক উপায় হলো সঠিক প্রশ্নটি করা।

আমরা যখন কোনো কিছু দেখি তখন তা কেন দেখি? দু'টি কারণ থাকতে পারে। হয় আমরা দেখতে চাই ব'লে দেখি, ফলে তা আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন, না হয় আমাদের দৃষ্টি এমনভাবে উন্মুক্ত থাকে যে, যা দেখা উচিত শুধু তাই দেখি। ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুযায়ী দেখি না।

আমরা যখন কোনো কিছু দেখি, সেই দেখার কাজের মধ্য দিয়ে জগৎ সম্পর্কে কোন ধরণের তথ্য গ্রহণ করি? আমি প্রশ্নটিকে অন্যভাবে

করছি। আপনি যখন একটি ফুল দেখলেন, কী কী দেখার কারণে আপনি ফুলটিকে দেখতে পেলেন? এবার প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা উত্তরের কিছু আভাসও দিতে পারি। আমরা ফুলটিকে দেখতে পাই এ কারণে যে, আমরা তার রং, আকৃতি, আকার ইত্যাদি দেখেছি। আকার দ্বারা ছোট বা বড়কে বোঝাচ্ছি। আকৃতি দ্বারা বুঝাচ্ছি তা ত্রিভুজাকৃতির কি না, চতুর্ভুজের মতো কি না, তার কৌণিকতা কেমন ইত্যাদি। এইগুলি হলো প্রকাশ্য জগতের বিভিন্ন মাত্রা বা ডাইমেনশন। এই ডাইমেনগুলির তথ্য আমরা চোখ দিয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম ব'লেই আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে সক্ষম।

কিন্তু এই ক্ষমতাই চোখের আসল ক্ষমতা নয়। চোখ যখন কিছু দেখে, তখন সে যা দেখল তার সঙ্গে তার নিজের ব্যাপারে যে ধারণা মনে আগে থেকেই সঞ্চিত আছে, তাকে মিলায়, এবং তখনই তা দেখতে পায় । আগে থেকেই কোনো ধারণা যদি মনের মধ্যে বদ্ধমূল না হয়ে থাকে, তাহলে সে দেখা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। জিনিষটা এমন হয় যে, তখন নিজেকে বলা যায় - এ দেখার শেষ নেই শতবার দেখে। আমরা যখন নিজের সন্তানকে দেখি, তখন যতই দেখি না কেন, সে দেখার শেষ হয় না। কারণ সে দেখার কোনো লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। সে দেখাকে যদি চিন্তা বলা হয়, তাহলে আমরা বলব যে সে চিন্তার কোনো সিদ্ধান্ত নেই। সেই দেখা নিজেই একটি উপভোগ, কোনো উপায় নয়। জগতে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিকে ব্যবহার করি একটি উপায় হিসেবে, তথ্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু সেই দৃষ্টি উপভোগেরও কারণ হতে পারে। যেমন একটু আগেই আমরা আলোচনায় দেখেছিলাম যে, আমরা যখন কোনো নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখি, তখন আমাদের অন্তর জুড়িয়ে যায়। মাথার মধ্যে চিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায়। আমরা বিস্মিত হই এবং আনন্দ পাই। এই সব ক্ষেত্রে দৃষ্টি কোনো উপায় নয়। তা একটি উপলব্ধি এবং উপভোগ।

আমরা কি আমাদের দৃষ্টি দিয়ে কখনও সত্যকে দেখেছি? আমি জবাবের দিকে যেতে চাই না, কারণ এই প্রশ্নটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বরং আমরা বলব যে যদি আমরা সত্যকে দেখতে পেতাম, তাহলে সারা পৃথিবীতে ভাই-বোন ছাড়া কিছুই দেখতাম না। যদি আমরা সত্যকে দেখতে পেতাম, তাহলে দেখতাম যে নিজের সন্তানকে দেখা যেমন আনন্দের, সমাজের অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে দেখা তেমনই আনন্দের, যদি সেই ব্যক্তি সমাজের কাছে ক্ষতিকর কিছু না হয়ে থাকে। আমরা যখন কোনো মানুষের দিকে তাকাই, তখন সেই মানুষটির সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা রয়েছে, আমরা তাকেই দেখি। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তার যে দুঃখ-কষ্ট, হতাশা ইত্যাদি রয়েছে তা কি আমাদের চোখে পড়ে? এ জন্যেই আল্লাহ বলেছেন যে দৃষ্টি অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় অন্তঃকরণ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না এই প্রশ্ন করলেই আমাদের অন্তঃকরণের অন্ধত্ব বা সেই অন্ধত্বের রীতি বা পরিমাণ আমাদের মনে ভেসে উঠবে।

আমরা কি অতীতকে দেখতে পাই? রবীঠাকুর গান গেয়েছিলেন: 'হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে, কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে'। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের ভুবনে অতীত রয়েছে, যা তার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে স্মৃতি আকারে। সেই স্মৃতি যাকে আকর্ষণ করে না, এমন কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই। এবং অতীত যখন কাউকে আকর্ষণ করে তখন সে অতীতে ফিরে যাওয়ার জন্য এতই বেশি কাতর হয়ে ওঠে যে, এই বিষয়টিকে চমৎকার একটি শব্দের মাধ্যমে চিহ্নিত করাও হয়েছে - নষ্টালজিয়া। যুগে যুগে সব সাহিত্যেই এই অনুভূতিটি এবং মানুষের মনের এই মধুর কষ্টটি মর্যাদার আসনে স্থান পেয়েছে।

অথচ তা সত্ত্বেও এ কথা বলার অধিকার আমাদের অনেকেরই নেই যে, আমরা অতীতকে দেখি। অতীত আমাদেরকে টানে এবং আমরা সেই আকর্ষণ অনুভব করি, একটি আশ্রয় খোঁজার প্রয়োজনে। বর্তমানের

মুখোমুখি হতে আমাদের অনেক ভয়। তাই আমরা অতীতের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চাই। কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেদিকে আমরা চলছি বটে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার সাহস আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। তাহলে পবিত্র কোরআনের এমন কিছু আয়াত আমাদের সঙ্গে কথা বলত, যার রহস্য জানলে অন্তর কখনও মরে না। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নূহের বোঝাই নৌকায় চড়িয়েছিলাম।

এটি ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু এর মধ্যে কি চমৎকার একটি বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব, ইনশাল্লাহ। কল্পনা করুন বর্তমান পৃথিবীটা এবং গোটা মহাবিশ্বই পেছন দিকে ছুটে যাচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তা নূহ (আ.) এর সময়ে এসে থেমে যায়। যেই পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলি নূহ (আ.) এর সময়ে গিয়ে থামল, অমনি আমরা নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি - এই সময়ে গোটা পৃথিবীর সমস্ত সত্যান্বেষী মানুষগুলো এই নৌকার মধ্যে অবস্থান করছে। এরা কারা?

এবং প্রশ্নকারী হিসেবে আমি এখন কোথায়?

২০০০ সাল বা ১৯০০ সাল বা ১৮০০ সাল - এই সময় সীমাগুলি তখন নিছক ভবিষ্যৎ। তাহলে ঐ সময়ে আমি কোথায় ছিলাম? আমি আমার অন্তরের চোখে দেখতে পাচ্ছি নূহ (আ.) তাঁর নৌকাটিকে তার স্বাভাবিক গতি-বিধির মধ্যে লক্ষ করছেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য লোক রয়েছেন, অনেক পশুপাখিও রয়েছে। আমি কোনো না কোনোভাবে কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে এই বিষয়টি দেখলাম। এখন আমার প্রশ্ন হলো: ঐ মুহূর্তে আমি কোথায় ছিলাম? তাদেরকে দেখার জন্য তাদের বাইরে

'আমি' ব'লে তো কেউ নেই, বা এই ভবিষ্যৎ থেকে আমি তো অতীতে পৌঁছে যাই নি? তবুও আমি সেখানে ছিলাম।

নূহ (আ.) এর নৌকার মধ্যে আপনি নিজেই ছিলেন।

এ কথা আমার কোনো অনুমান নয়, বা আমার নিছক কথকতা নয়। এ আল্লাহরই দেয়া তথ্য। তিনি বলেছেন যে, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বোঝাই নৌকায় চড়িয়েছিলেন এবং উদ্ধার করেছিলেন। তারা যদি আমাদের পূর্বপুরুষই হয়ে থাকেন, তাহলে আমরাও তখন ছিলাম তাদের রক্ত-মাংস, কামনা-বাসনার মধ্যে, তাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। অর্থাৎ আমাদের গোটা মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কঠিন বিপদের সময়ে তারা নৌকার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হয়তো শীতে ঠক ঠক ক'রে কেঁপেছিলেন, হয়তো সময় মতো আহার পাননি, প্রচণ্ডভাবে অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়তো দোদুল্যমান হতে হয়েছে - কখন এই বিপদের অবসান ঘটবে, কখন তারা রেহাই পাবেন, কখন আবার জীবনের আবাদ করার জন্য পৃথিবীর জমিনে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করবেন। এবং তাদের এই কামনা-বাসনা, স্বপ্ন আহ্লাদ সবকিছুর পেছনে, সবকিছুর ব্যাকগ্রাউন্ডে, ছিল আমাদেরই অস্তিত্বের সম্ভাবনা - গোটা মানবজাতিকে সৃষ্টি করা, গোটা মানবজাতিকে লালন করার বাসনা।

তারা আত্মরক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকেই রক্ষা করেছিলেন।

এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে ঐ মুহূর্তে ব'সে তারা যে কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই কষ্টের প্রতি কি আমরা কোনো সহানুভূতি দেখিয়ে থাকি?

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় - তোমার বাবার নাম কী? আমি হয়তো বলব - আমার বাবার নাম ক। তার পর যদি প্রশ্ন করা - হয় তার বাবার নাম কী? আমি হয়তো বলব খ। তারপর যদি প্রশ্ন করা হয় - তার বাবার নাম কী? আমি হয়তো চুপ হয়ে যাব। কারণ ঐ পর্যন্ত আমার জ্ঞান পৌঁছাচ্ছে না।

সচরাচর আমাদের অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের তালিকা সংরক্ষিত হয় না। না হবার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ আমাদের মন থেকেই তারা উঠে গেছেন। আমরা তাদেরকে স্মরণই করি না, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি না। অথচ আমার জন্মদাতা পিতা যিনি, তার চেয়ে তারা আমার বেশি আপন ছাড়া কম আপন নন। কারণ তারাই আমাদের জন্মের আদি কারণ। তাদের আগে যারা ছিলেন তারা আরও আদি কারণ। আদিকে অস্বীকার ক'রে অন্ত কীভাবে টিকে থাকে? কার্ল মার্কসের যে কথাটি আমরা প্রসঙ্গক্রমে এনেছিলাম - বিচ্ছিন্নতা, তা আবারও স্মরণ করি। আমাদের অতীত থেকে বর্তমান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা এখন নূহ (আ.) এর মতো ঐ কঠিন সময়ে অবস্থান করছি, যেখানে গোটা মহাবিশ্ব ডুবে আছে আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা, পাপ কদর্যতার বন্যায়, এবং তার ওপরে আমাদের জীবনের নৌকাগুলো ভাসছে লক্ষ্যহীনভাবে।

আমরা চেষ্টা ক'রেও আমাদের দাদার বা নানার পেছনে বা তার পেছনে যিনি আছেন, তাদের কথা স্মরণ করতে পারি না। কারণ তাদের প্রতি আমাদের কোনো মমত্ববোধই জাগে না। যদি এই মুহূর্তে তারা বেঁচে থাকতেন, তারা ঠিকই আমাদের সবাইকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। অথচ তাদের প্রতি আমরা কতটা কৃতজ্ঞ সে ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে। তার একটি প্রমাণ হিসেবে আমরা ছোট্ট একটি উদাহরণ নিতে পারি। আমরা আমাদের বাবাদেরকে যত

ভালোবাসি, আমাদের সন্তানদেরকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। এ আমাদের একটি অন্ধত্ব এবং অপূর্ণাঙ্গতা। আমাদের বাবারা আমাদেরকে যতটুকু ভালোবাসেন, আমরা কোনোদিন তাদেরকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারব না। সে যোগ্যতাই আমাদের নেই। অথচ তাদের ভালোবাসার কারণেই আমরা লালিত হয়েছি। তাদের ভালোবাসার কারণেই আমাদের সন্তানেরা পৃথিবীতে আসতে পেরেছে। তাদের জীবন সার্থক হয়েছে। তারা আমাদেরকে শিশুকালে যতটুকু ভালোবাসতেন এখন তার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন আমাদেরই সন্ত ানদেরকে। সুতরাং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার যোগ্যতাই আমাদের নেই। তার পরেও আমি কত বড় অকৃতজ্ঞ যে, আমার বাবাকে ভালোবাসি কিন্তু তার বাবাকে ভালোবাসি না। তার বাবাকে ভালোবাসি কিন্তু তার বাবাকে ভালোবাসি না। অর্থাৎ আমাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত স্বার্থপর, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। এই মানসিকতা নিয়ে আমরা কখনোই সত্যকে জানতে পারব না, সত্যকে ধারণ করতে পারব না।

এখানে আমরা আর একটি রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছি, ইনশাল্লাহ। সত্যকে কে না জানতে চায়? সত্য জানার তৃষ্ণা যদি কারো এক বিন্দু জেগে থাকে, সে ধন্য। সে বেহেশতে যাবে নাকি দোযখে যাবে, তা আমরা কেউ জানি না। আসলে আজীবন আল্লাহর ইবাদত ক'রে সত্যকে জেনে, নামাজ রোজা ক'রেও আমরা কেউ কখনও বরতে পারি না যে আমরা বেহেশতে যাব নাকি দোযখে যাব, যদি কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে না দেন। সুতরাং সেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার। কিন্তু আমার জীবন অর্থপূর্ণ হলো কি না, আমি তৃপ্ত হলাম কি না, এটা আমি জানতে পারি। আমি যদি সত্যকে জানি, তাহলে সত্যকে জানার কারণে আমার জীবনকে আনন্দে ভরপুর হয়ে যাবে। নতুন ক'রে কোনোকিছুর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। এবং বাকি যা কিছু ঘটার কথা তা যে আল্লাহর

পরিকল্পনায় আছে তা জেনেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তাঁর জ্ঞানে তিনি যা জেনে রেখেছেন তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। নতুন ক'রে সেখানে উঁকি মারার কোনো প্রয়োজন হবে না।

আমরা এখন এই বিষয়ের একটি বিশেষ মাত্রাকে জানার জন্য আবারও ইব্রাহিম (আ.) এর উদাহরণটি টেনে আনতে পারি। একটু খেয়াল ক'রে দেখুন। বাবার আদর কে না চায়? অথচ যে বয়সে ইব্রাহিম (আ.) এর বাবার আদর ভালোবাসা, যত্ন, তার আশ্রয় পাওয়ার কথা ছিল, সেই বয়সে তিনি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আমরা যদি কোনো না কোনা কারণে বাবা-মা থেকে কিছুকাল দূরে থাকি, তারপর যখন বাবা-মার কাছে যাই, তখন মনে আমার বাব-মা-ই আমার জন্য গোটা মহাবিশ্ব - গোটা পৃথিবীতে তাদের বাইরে আর কিছু নেই। এত তীব্র আকর্ষণ, যা ব্ল্যাকহোলের চেয়েও মানুষকে বেশি টানে, সেই আকর্ষণ না থাকলে আমরা কখনোই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারি না। কখনোই সুস্থ মনের অধিকারী হতে পারি না।

এমন কিছু জিনিষ পৃথিবীতে থাকতেই হবে যাকে মানুষ ভালোবাসবে। প্রতিটি খারাপ মানুষও পৃথিবীতে কোনো কোনো জিনিষকে ভালোবাসা। এবং তাকে সে ধর্মের গুরুত্বে লালন করে। বাবা-মাকে ভালোবাসা মানে ধর্মকে ভালোবাসা। এবং বাবা-মায়ের কাছ থেকে ভালোবাসা, আহলাদ, আদর, যত্ন এগুলো পাওয়া মানে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া। অর্থাৎ আমাদের দেহ এবং মনের প্রবণতা, চাহিদা সবকিছুর সঙ্গেই বিষয়গুলি জড়িত। তা সত্ত্বেও ইব্রাহিম (আ.) এর মতো মানুষ, যাকে আমরা মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে জানি, তিনি বাবার আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শুধু আদর নয়, বাবার অন্তরে তার জন্য কোনো জায়গাই ছিল না। আদর থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে বাহ্যিক অর্থে একটু দূরে

থাকা। তাতেও মানুষ খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু তার বাবার অন্তরে তার জন্য কোনো জায়গা ছিল না, এই কথা তিনি যখন জানতে পারলেন তখন তার অন্তর কতখানি কষ্টে ভ'রে গিয়েছিল একটু ভেবে দেখুন তো। এভাবে আমরা ইব্রাহিম (আ.) এর জীবনের প্রাথমিক কষ্টটাকে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর বাবা তাঁর সত্য কথাটি সহ্য করতে পারেননি। তাই তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি বাবাকে বলেছিলেন - আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব। এবং আল্লাহর কাছে তিনি দোয়াও করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে জানিয়েও দিয়েছিলেন যে তাঁর বাবার সম্পর্কে তিনি যতই দোয়া করেন না কেন, তা কবুল করা হবে না, কারণ তার বাবা আল্লাহকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহর নবীকেই তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। সুতরাং তার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তার বিরুদ্ধে আল্লাহর বিচারে এতখানি কঠোরতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ইব্রাহিম (আ.) তার বাবার জন্য দোয়া করলেন। কত অসাধারণ দায়িত্বপূর্ণ সন্তান তিনি ছিলেন এই উদাহরণ থেকে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে বাবা-মা যদি কাফেরও হয়, তবুও তারা বাবা-মা-ই। তাদের কথা শোনা যাবে না, কিন্তু তাদের ওপর নিজের যে দায়িত্ব তা পালন করতেই হবে। এক দিকে দায়িত্ব পালন তার অধিকার, অন্য দিকে আমাদের অন্তরের নিজস্ব দাবি মেটাতে গিয়েই তাদেরকে ভালোবাসতে হবে, নইলে আমাদের অন্তর সজীব ও সতেজ থাকবে না।

এখন চলুন ইব্রাহিম (আ.) এর জীবনের শেষ দিকটা একটু লক্ষ করি। একই ঘটনা শেষ দিকেও ঘটেছিল। সন্তান হিসেবে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন। বাবাকে পাননি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যখন সন্তান পেলেন, তখন আল্লাহ বললেন - তোমার সন্তানকে তুমি কোরবানি কর। এক দিকে বাবার আদর পাননি, আর এক দিকে নিজের সন্তানকেও আদর

করার সময়ে আল্লাহ বাধ সেধে ব'সে আছেন। এই দুইটি বিষয় আমরা পাশাপাশি কখনোই বিবেচনা করি না। বিষয়গুলি আমাদের জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই জ্ঞান গোটা মহাবিশ্বের সম্পদ। কোনো ব্যক্তির সম্পদ নয়। তিনি তার বাবার আদর পাননি। এভাবে তিনি তাঁর অতীত হারালেন। তারপর আল্লাহ তাঁর অন্তর থেকে সন্তানকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে বললেন।

এভাবে তিনি তার ভবিষ্যৎকে হারালেন। তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। আল্লাহ ছাড়া তার আর কিছুই রইল না।

একটা মজার ব্যাপর হলো, সন্তানকে একবার পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার পর সেই সন্তানকে দেখলে অন্তর জুড়িয়ে যায়। চোখ জুড়িয়ে যায়। তখন তাকে লক্ষ কোটি বছর ধ'রে আদর করলেও তা সংকীর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে না।

নিজের সন্তানকে ত্যাগ করার মাধ্যমে তিনি গোটা মানবজাতির বাবা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। গোটা মানবজাতির পিতার আসনে নিজেকে বসিয়েছেন। শুধু একটি সন্তানের বাবা হয়ে ব'সে থাকেননি।

একটি চমৎকার মিল লক্ষ করা যাক। ইব্রাহিম (আ.) এর বাবা তাঁর সন্তাকে, অর্থাৎ ইব্রাহিম (আ.) কে, ত্যাগ করেছিলেন। ঠিক আল্লাহ ইব্রাহিম (আ.) কেও বললেন - তোমার সন্তানকেও তুমি ত্যাগ কর। কিন্তু দেখুন, এই দুই ত্যাগের মধ্যে কি বিশাল পার্থক্য। ইব্রাহিম (আ.) এর বাবা যখন ইব্রাহিম (আ.) কে ত্যাগ করলেন, তখন তিনি গোটা মহাবিশ্বকে ত্যাগ করলেন, ত্যাগ করলেন আল্লাহকেও। ইব্রাহিম (আ.) যেহেতু গোটা মহাবিশ্বের বাবা, সেহেতু তাকে ত্যাগ করা মানেই পৃথিবীর পরবর্তী সমুদয় বংশধরকে ত্যাগ করা এবং সে ব্যাপারে

দায়িত্বহীন হয়ে যাওয়া। অথচ ইব্রাহিম (আ.) তাঁর সন্তানকে ত্যাগ করলেন এবং নিজের অন্তরের সংকীর্ণতার সম্ভাবনা নষ্ট ক'রে দিলেন, যেন শুধু একটি সন্তানকেই তিনি সন্তান হিসেবে গণ্য না করেন, যেন তিনি বুঝতে পারেন এই সন্তানের মধ্য দিয়ে মানবজাতির যে অংশ জগতে আবাদ লাভ করবে, তারা সবাই তাঁর অন্তরেই আছে। ইব্রাহিম (আ.) যে মানব জাতির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন, গোটা মুসলমান জাতি শুধু নয়, ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিরও তিনি পিতা ছিলেন, তা আল্লাহ বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন - সরাসরি স্পষ্টভাবে প্রচার ক'রে, যা আমরা কোরআনে পেয়েছি যে ইব্রাহিম (আ.) ছিলেন গোটা বিশ্বাসী জাতির পিতা, এবং তিনিই আমাদেরকে মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন, এবং একটু আগে আমরা তার জীবনের ছোট্ট দুইটি কাহিনী বিশ্লেষণ ক'রে যে সত্য উদ্ঘাটন করলাম এর মাধ্যমে তিনি ইব্রাহিম (আ.) এর ব্যক্তিত্ব এবং গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন।

আমরা বহু দূর চ'লে এসেছি। সুতরাং আবারও আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। আমরা দেখলাম যে অতীতকে দেখতে আমরা ব্যর্থ, যদিও আমদের কবিগণ অতীত নিয়ে কবিতা লেখেন, অতীত কাতরতায় ভোগেন। গোটা মানব জাতিটাই অতীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সুতরাং যত পেছন দিকে যাওয়া যাবে, ততই আমাদের অন্তরে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, প্রেম, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ বেশি জাগার কথা। অতীতে যারা বিগত হয়েছেন, তাদের জন্য দোয়া করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর নিছক সেই দোয়া কথকতায় রূপান্তরিত হবে, যদি আমাদের কাছে তাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব ও অর্থ স্পষ্ট না হয়। যেমন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, যাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই তাদের প্রার্থনা নিছক কথকতা মাত্র। ফলে সেই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে পৌছায় না। অতীত আমাদের জীবনের এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন উৎস বিন্দুকে

ধারণ করে। তাই আমাদের উচিত একটু সময় পেলে চোখ দুটি বন্ধ ক'রে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে অন্তরকে অতীতে পৌঁছে দেয়া। এবং অতীতে নবী-রসূলগণ এবং আল্লাহর অলিগণ কত পরিশ্রম করেছেন যেভাবে আমাদেরকে অন্তরে এবং রক্তের মধ্যে লালন করেছেন, তা উপলব্ধি করা। একই সঙ্গে অতীতে কত জাতি নিজের কর্মকাণ্ডের কারণে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে, তাও উপলব্ধি করা। গোটা মহাবিশ্বের প্রতি একটি দায়িত্ববোধ অন্তরে না জাগা পর্যন্ত সেই অন্তর কখনোই অন্ধত্ব মুক্ত হবে না। তার আগ পর্যন্ত কখনোই আমাদের দৃষ্টি খুলবে না।

অতীত কারো একার নয়। তাতে সবারই সমান অধিকার। তাই তো অতীতের স্মরণে আমরা এত শান্তি পাই। ভবিষ্যৎ প্রত্যেকের একার। তাই ভবিষ্যৎ চিন্তা সর্বদাই দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হয়।

দৃষ্টি সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, আমরা যখন কোনো কিছু দেখি, তখন সেই জিনিষটির বা পরিস্থিতিটির পূর্ণাঙ্গতাকে দেখি না, প্রকাশিত অপূর্ণাঙ্গ রূপটিকে দেখি, ফলে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। দেখা মানে হলো পূর্ণাঙ্গতাকে দেখা। একটি উদাহরণ নিলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্ত্রীর বকবকানির কারণে সবাই কম-বেশি কষ্ট পান। অধিকাংশ সংসারে এ নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়, ঝগড়া লাগে। এখানে আমাদের দুটি কথা রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লাগা অনেক ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অশান্তির সৃষ্টি হওয়া কিন্তু আমাদেরই দ্বারা আমাদের অন্তরে চাপিয়ে দেয়া একটি অবস্থা। স্ত্রীর বকবকানির কারণে আমরা মাঝে মাঝে বিরক্ত হতে পারি, তার কারণে ঝগড়াও লাগতে পারে, কিন্তু সে কারণে তাকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। সঠিক সত্যটিকে

জানলে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। একটু ভেবে দেখুন, যে নারী মা হয়েছে, তার ঘাড়ে কত বড় দায়িত্ব - স্বামীর সংসার সামলানো, সন্তানদের যত্ন, খাওয়া-দাওয়া, স্বাস্থ্য রক্ষা, লেখাপড়া এবং ভবিষ্যতে সংসারের অবস্থা সবকিছুই তাকে ভাবিত করে। মা মানে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, যত্ন, সবকিছুর উৎস। সেই স্নেহ মমতা তিনি কিভাবে প্রকাশ করবেন, যদি তার হাতে পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ বা ক্ষমতা না থাকে? এ কারণে তাকে সব সময়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। আর এই দুশ্চিন্তা থেকে যে অস্থিরতা উঠে আসে, তার কারণে তাকে অনেক সময়ে অনর্থক বকবকানি ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি করার প্রয়োজন হয়।

তবে এর সঙ্গে আর একটি বিষয় রয়েছে। যাদের বাড়িতে বিভিন্ন বয়সের ছোট বাচ্চা রয়েছে তারা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। ভোর বেলায় যখন বাচ্চাদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন তাদেরকে ঘুম থেকে উঠাতে অনেক কথা খরচ করতে হয়, অনেক কষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কাজটি যদি পুরুষদেরকে করতে হতো, তাহলে দেখা যেত যে সপ্তাহে দুই তিন দিন এমন চ'লে গেছে, যখন ঐ বাচ্চাগুলো স্কুলেই যেতে পারেনি। কিন্তু মাকে ঠিকই সবকিছুর মধ্যে এই বিষয়টিও বজায় রাখতে হয়। এ কারণে তাকে চোঁচামেচি করতে হয়। বাচ্চাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকতা শেখানোর জন্য, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, আহারে আগ্রহী করার জন্য, লেখাপড়া শেখানোর জন্য - মোটের ওপর তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাকে সব সময়ে কিছু না কিছু ভাবতে হয় এবং করতে হয়। এই বিশাল দায়িত্বের বোঝা সর্বদা তার ঘাড়ে থাকে ব'লে তার আশ্বাস পাওয়ার প্রয়োজন হয়। তার হাতে শক্তির প্রয়োজন হয়, ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। তাই তিনি তার চাহিদার অধিকাংশ ভারই স্বামীর ওপরেই চাপিয়ে থাকেন। এই বিষয়টি বুঝলে আমাদের মধ্যে একটি সহানুভূতি জন্মাবে। আমরা বুঝতে পারব আল্লাহ তার মধ্যে মাতৃত্ব ঢেলে

দিয়েছেন আর সেই ভার তাকে কত কষ্টের মধ্য দিয়ে সহ্য করতে হচ্ছে, এবং এভাবে সে মাতৃত্বের দায়িত্ব তাকে পালন করতে হচ্ছে।

তবে আমরা এ কথা বলছি না যে কিছু কিছু স্ত্রীর আচরণ সীমালঙ্ঘন করে না। সবকিছুর একটা সীমা আছে। সীমার বাইরে যদি কেউ চ'লে যায়, তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তার সঙ্গে চুক্তি হতে পারে, তার পরিবার এবং আপনার পরিবারের একজন নিয়ে বৈঠক করতে পারেন। আরও অনেক পদক্ষেপ রয়েছে যা আল্লাহ আমাদেরকেই পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন। এবং অবশেষে কোনো পদক্ষেপে কোনো ফল না হলে সেক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

আমরা বিশেষ ক'রে ভারত বর্ষের এই অঞ্চলের মুসলমানেরা বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে খুব বেশি ভাবি। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারেই আবশ্যিক হয়ে যায়। একটি নারীকে জোর ক'রে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে নির্যাতন করার চেয়ে তালাক দেয়া অনেক ক্ষেত্রে বেশি মানবিক। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিরক্ত ও শ্রদ্ধাহীন হয়ে ওঠে। এর ফলে সংসারের অশান্তি, অমিল এবং গরমিল সবকিছুই দেখা দেয়। এই জাতীয় অবস্থা যখন দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন তার সমাধানের একমাত্র উপায় হলো তালাক। আমাদের সমাজে আমরা সচরাচর এই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, তালাক হলো একটি নিকৃষ্ট কাজ। আর এইভাবে আমরা ভাবি ব'লে তালাকপ্রাপ্ত নারীকেও কেউ বিয়ে করতে চায় না। এমনকি তালাকপ্রাপ্ত পুরুষকেও অনেকে স্বামী হিসেবে দেখতে চায় না। আমাদের এই ভাবনার মধ্যে ছোটখাটো কোনো ভুল নেই, খুব বড় ধরণের ভুল রয়েছে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কোরআনে 'বিয়ে' নামে কোনো সূরা নেই। কিন্তু 'তালাক' নামে একটি

সূরা আছে। তালাক যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হতো, তাহলে সেই নামে সূরারই কোনো প্রয়োজন হতো না। যেহেতু বিয়ে-সাদীর মধ্যে অনেক বিফলতা, দুঃখ-কষ্ট, ঝামেলা, ঝগড়া ঝাটি, মনের অমিল, পরিবারে পরিবারে সংঘাত ইত্যাদি সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, সেহেতু সেখানে তালাকেরও প্রয়োজন আছে। এমনকি তালাকের সময়েও অনেক সমাজে এখনও পর্যন্ত নারীকে বঞ্চিত করা হয়। এই সব বিষয়গুলিকে নজরে রেখে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সূরা তালাক অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ দান করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এসেছে ব'লে আমাদেরকে আর একটি কথা বলতে হবে: যে কোনো নারী পুরুষের মধ্যে তালাকের প্রয়োজনীয়তা যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে সেখানে তালাক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে মনে ক'রে ফেলি যে যার সঙ্গে আমার তালাক হলো, পথে চলতে গেলে তার মুখও দেখা আমার জন্য অন্যায়। অর্থাৎ তালাক হলো ব'লে সে আমার শত্রু হয়ে গেল। আসলে বিষয়টি তা হওয়া উচিৎ নয়। বিয়ের আগেও দুই স্বামী-স্ত্রী কিন্তু ভাই-বোনই ছিল। কারণ আমরা সবাই বিশ্বাসী। বিশ্বাসী প্রতিটা মানুষই ভাই-ভাই বা ভাই-বোন। কিন্তু বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ভাই-বোন নয়। কারণ এটি নয় যে তারা ভাইবোন নয়। বরং এই কারণে যে অবিশ্বাসী গোটা মানবজাতির ঐক্যকে অস্বীকার করে। তারা অস্বীকার করে যে আমরা সবাই একই বাবা-মা থেকে উদ্ভূত হয়েছি। আর ভাই-বোন হতে পারে না ব'লেই তাদের মধ্যে বিয়ে সংঘটিত হয় না। তাহলে দেখা গেল যে, সহোদর ভাইবোন ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বিয়ে সম্ভব কেবল ভাইবোনের মধ্যে। অর্থাৎ উভয়কেই বিশ্বাসী হতে হবে।

যা হোক, আমরা এ থেকে একটি বিষয় তুলে আনব, এবং সেই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখব। তা হলো, বিয়ের আগে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা পরস্পর ভাইবোন। ফলে ইভটিজিং এবং

এই জাতীয় অপরাধ আমরা যেন না করি। এবং যদি কখনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক হয়ে যায়, তাহলে তালাকের পরেও ভাবতে হবে যে আমরা ভাই-বোন, ফলে তালাক হয়ে গেছে ব'লেই সে আমার শত্রু হয়ে গেছে এরূপ ভাবার কোনো যুক্তি নেই। হতে পারে আমরা দুজনই ভালো মানুষ, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো কারণে মিল হয়নি। হয়তো বা এটিই ছিল পূর্বনির্ধারণ। আমার স্ত্রী যদি আর কোরো সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় হয়তো তার জীবনে সুখ আসবে। আমিও যদি অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করি হয়তো আমার জীবনেও সুখ আসবে। সুতরাং আমাদের দুজনের মধ্যেই কেউ যে খারাপ, এমনটি ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ খারাপ না হলেও সেখানে তালাক সম্ভব। আল্লাহ কোরআনে এমনভাবে বিধান দিয়েছেন, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেউ বিয়ে করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেও তালাক প্রদান করতে পারে। পৃথিবীতে এবং মানব জীবনে সব কিছুরই প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই সে জন্যে বিধান রয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জাতীয় ঘটনা ঘটেই না, তবু যদি ঘটে সেই ক্ষেত্রে বিধান কী হবে, এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। বা ঘটার পর আমরা অবশ্যই বিধান অনুসন্ধান করব। তাই আল্লাহ সব ব'লে রেখেছেন।

আমরা যা বলছিলাম - দৃষ্টিশক্তি এবং অন্ধত্ব। আমরা বলেছিলাম যে চোখ যখন জগতের দৃশ্যমান বিষয়গুলিকে দেখে তখন দৃশ্যমান যে কোনো বস্তুর মাত্রা দেখার মাধ্যমেই এই দেখার কাজ সংগঠিত হয়। যেমন রং, আকৃতি, আকার, ইত্যাদি। এই দৃশ্যমান বস্তু এবং ব্যবস্থার এবং পরিস্থিতির আড়ালে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা সবকিছুর ঐক্যের স্তরে কাজ করে। যা চোখ দিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে কিংবা জ্ঞান অর্জনের আগে অনুমান গঠন করতে হলে চোখের মাধ্যমে প্রথমে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি গ্রহণ করতে

হয়। অর্থাৎ সেই উপলব্ধি বা বোধের আগে দেখার কাজটি ঘটতে হবে। সুতরাং সেই আলোচনা দেখার প্রসঙ্গেই আসা উচিত।

এখন আমাদের মনে একটি মৌলিক প্রশ্ন আসতে পারে। আমরা চোখ মেলে তাকালাম। কিছু দেখলাম এই দেখা অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছাবে কী ক'রে? আমরা এর আগে বিভিন্ন উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি যে, দেখা যখন অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন সত্যকে দেখা যায়। তাই এখন আমাদের প্রশ্ন হলো: দেখাকে কিভাবে অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে? তাহলে কি বাইরের চোখ দিয়ে বাহ্যিক বস্তু এবং পরিস্থিতি এবং ব্যবস্থাকে দেখতে হবে? এবং অন্তরে কি আর একটি চোখ রয়েছে? যা দিয়ে সেই তথ্যগুলিকে নতুন ক'রে দেখতে হবে?

আসলে এইভাবে আমরা হয়তো চিন্তা করতে পারি। কিন্তু এই ধরণের চিন্তা হবে কৃত্রিমতাপূর্ণ। বরং আমরা দেখার পর যা লাভ করি, তা যে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, এই কথাটিকে খেয়াল রেখে এই বিষয়ের দিকেও খেয়াল দিতে হবে যে, আমরা যখন দেখি, তখন আমাদের সেই দেখা প্রভাবিত হয় আমাদের মনের কতকগুলি যোগ্যতা অযোগ্যতার দ্বারা। সেগুলি হলো আমাদের সহানুভূতি, আমাদের তৃষ্ণা, আমাদের মানসিক অবস্থা যেমন আনন্দ, বেদনা, বিরক্তি, আগ্রহ, বিস্ময় ইত্যাদি, আমাদের ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে এগুলির মধ্য দিয়েই আমরা দেখি।

এখন আমরা আমাদের মূল আবিষ্কারের সন্ধান পেয়েছি। আমরা দেখছি শুধু আমাদের চোখ দিয়ে নয়, আমাদের মন দিয়েও। এবং মনের যতগুলি প্রবণতা, শক্তি বা ফ্যাকালটি রয়েছে, তাদের যেগুলি দেখার কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলি আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। সুতরাং মনের সেই প্রতিটি যোগ্যতাও একটি চোখ। যেমন আমি বিপদে আছি। আপনি আমার দিকে তাকালেন। আপনার চোখের পেছনে রয়েছে

সহানুভূতি। সুতরাং আপনি আমাকে আমার দুঃখের মধ্যে সঠিকভাবেই দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনার অন্তরে যদি সহানুভূতি কাজ না করে, তাহলে হয়তো আপনি দেখবেন যে একটি মাটির তৈরি করা জীবন্ত পুতুল ব'সে আছে। যেহেতু আপনার মধ্যে সহানুভূতি নেই, সেহেতু আমার মধ্যে যে কি দুঃখ-কষ্ট বিরাজ করছে, সে ব্যাপারে আপনি কোনো অনুমানই করতে পারবেন না। আমাদের সব অনুমানই শুরু হয় আমাদের উপলব্ধি বা অনুভূতি থেকে। সেই উপলব্ধিতে যদি ঘাটতি রয়ে যায়, তাহলে অনুমান কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না।

আমরা সচরাচর কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার কথা ব'লে থাকি। আমাদের এই শব্দ প্রয়োগের মধ্যেই প্রমাণ রয়ে গেছে যে ক্ষমা নিজেই একটি দৃষ্টি। ক্ষমার দৃষ্টির আলোয় যদি কোনো বিষয়কে দেখা যায়, তাহলে সেই বিষয়ের প্রতি দ্রষ্টার যে মনোভাব সৃষ্টি হবে, তা হবে এক ধরনের এবং সেই দেখার মধ্যে যদি ক্ষমা না থাকে, তাহলে তা হবে অন্য ধরনের।

এভাবে আমরা বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে জগৎকে দেখছি। আমরা বস্তুকে দেখি এক দৃষ্টি দিয়ে, ভাবকে দেখছি ভিন্ন একটি দৃষ্টি দিয়ে, অতীতকে দেখছি অন্য দৃষ্টি দিয়ে, ভবিষ্যৎকে দেখছি আর এক দৃষ্টি দিয়ে। বর্তমানকে হয়তো আমরা দেখিই না, দেখতে পারলে ভালোই হতো। জ্ঞানের চোখ দিয়েও আমরা দেখি, বিশ্বাসের চোখ দিয়েও আমরা দেখি। সুতরাং আল্লাহ আমাদের মনে যত রকমের যোগ্যতা দান করেছেন তার প্রতিটি যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যদি কিছু দেখতে পাই, কেবল তখনই আমরা দাবি করতে পারব যে আমাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। নইলে আমাদের অন্ধত্ব আমাদের মুক্তিকে চিরকাল বাধাগ্রস্ত ক'রে রাখবে।

(তাওহীদ ও আদম)

গোটা কোরআনে আল্লাহ তাঁর নিজের যে বৈশিষ্ট্যের কথা সবচেয়ে বেশিবার বলেছেন এবং যে বৈশিষ্ট্যের কথা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন, তা হলো তাঁর একত্ব। তিনি সব পাপ ক্ষমা ক'রে দিতে পারেন এবং দেবেনও, তাঁর একত্বকে অস্বীকার করার পাপ ছাড়া। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তিনি আদী, তিনি অন্ত। তিনি শয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরনির্ভরশীলতাহীন, প্রেমময়, দয়াময় ইত্যাদি। তাঁর প্রতিটি নাম থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি এক। তাঁর একত্ব সব ধর্মবিশ্বাসের মূল। যদি এমন কোনো সুন্দর ধর্মের সন্ধান মেলে, যা সমাজের মধ্যে মানুষকে খুব সুখী-সমৃদ্ধ এবং উশৃংখলতাহীন জীবন-যাপন করতে সাহায্য করবে, তাও আদৌ কোনো ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে না, যদি তার ভিত্তিমূল একত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। ফলে কোনো না কোনো কারণে সাময়িক সময়ের জন্য সেই ধর্মের প্রতি কিছু লোক আকৃষ্ট হলেও, তারাই আবার কিছুদিন পর সেই ধর্মকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে। এই জাতীয় একটি ধর্মের উদাহরণ আমরা জানি। কমিউনিজিম। কমিউনিজিম এর বাহ্যিক কথাবার্তাগুলো অনেকের কাছেই সুন্দর লাগবে। বিশেষ ক'রে যদি তিনি হন দুঃখতাড়িত, ভাগ্য-

বঞ্চিত, অর্থনৈতিকভাবে জর্জরিত, এবং কোনো না কোনোভাবে নির্যাতিত। কিন্তু তথাকথিত এই ধর্মের ছায়াতলে গিয়ে কোনো ব্যক্তি বেশি দিন সুখে থাকতে পারবে না, কারণ তা মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদকে হরণ করে - স্বাধীনতা। এবং মানুষের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্পদকেও তারা হরণ করে - বিশ্বাস। এই জায়গাগুলোকে যদি তারা খালি রেখে দিত, তাহলেও কোনো সমস্যা হতো না - যার ইচ্ছা বিশ্বাস করবে যার ইচ্ছা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই জায়গাগুলো খালি রেখে না দিয়ে তারা নিজেদের মতবাদ দিয়ে ভরাট ক'রে ফেলেছে, ফলে তাদের কথা বিশ্বাস না ক'রে কোনো উপায় নেই, যদি তাদের সঙ্গে চলতে হয়। এভাবে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে কমিউনিজিম জগতের শ্রেষ্ট ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে চেয়েছিল, এবং কমিউনিস্টরা এই জগতের লর্ড হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা সে কাজে ব্যর্থ হয়েছে।

তাওহীদ একেবারে ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক স্তরের একটি ব্যাপার। তাওহীদের ওপর যদি কোনো বিশ্বাস স্থাপিত না হয়, তাহলে সেই বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস বলার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক আল্লাহ ব'লে চিৎকার করি, অথচ আচরণে এমন কিছু স্বভাবকে প্রকাশ ক'রে ফেলি যা থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই আমরা এক আল্লাহকে আদৌ স্বীকার করি কি না, বিশ্বাস করি কি না, কিংবা ভালোবাসি কি না।

হযরত আলী (রাঃ)'র বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের সবাই একই যুক্তি দেখিয়েছিল, এবং তাদের অনুসারীদেরকে তাওহীদের বাণী শুনিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল এরূপ - আমরা আল্লাহকে মানি, আল্লাহর আনুগত্য করি, আর এ কারণে আমরা আলীর আনুগত্য করি না। তারা যা বলেছিল, মুখের বাণী হিসেবে তা ছিল খুবই সুন্দর। তার

মধ্যে কোনো মিথ্যা ছিল না। এক আল্লাহ ছাড়া কারও আনুগত্য করার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু তাদের এই বাণী সঠিক ছিল না, কারণ তারা যে উদ্দেশ্যে বা যে উপলব্ধি থেকে তাড়িত হয়ে কথাগুলি বলেছিল, তার মধ্যে তাওহীদের নামগন্ধও ছিল না। তারা আল্লাহকেই যদি ভালবাসবে, এবং স্বীকার করবে, সেই আল্লাহই যাকে খেলাফত দান করেছেন, কেন তার আনুগত্য করবে না? অথচ আল্লাহর একত্বের প্রতি তাদের সম্মান অটুট রয়েছে, এই যুক্তি দেখিয়ে তারা প্রচুর লোক সংগ্রহ করতে পারলো। তারা হযরত আলী (রাঃ) মতো ব্যক্তিকেও কষ্ট দিতে দ্বিধা করলো না। অবশেষে তাকে হত্যাও করলো। তাওহীদের বিশ্বাসের মধ্যে এই যে ত্রুটি, এই ত্রুটিটাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। আল্লাহ এক - এতে হয়তো নাস্তিকেরও কোনো সন্দেহ নেই। আমি অনেক নাস্তিক দেখেছি যারা বলেন যে যদি আল্লাহ ব'লে কিছু থাকতেই হয়, তাহলে তা একজনই হতে হবে, দুইজন সম্ভব নয়। আমাদের কমন সেন্স থেকেও আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারি, এবং কোরআনে আল্লাহ নিজেই আমাদের এই কমন সেন্স ব্যবহার ক'রে চমৎকার যুক্তি দেখিয়ে নিজের একত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাহলে আমরা কিছু আয়াত দেখি:

বলো, 'ওদের কথামতো যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশের অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় খুঁজত।

(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত: ৪২)

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তাঁরই, আর সকল সময়ের জন্য কর্তব্য তাঁরই প্রতি। তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অপরকে ভয় করবে?

(সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ৫২)

সব ধর্মের মধ্যেই ভাঙ্গন, ফাটল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, মত-মতবিরোধ, আত্মবিরোধ ইত্যাদি বিদ্যমান। সবচেয়ে বেশি বিভক্তি রয়েছে ইসলাম ধর্মের মধ্যে। রাসুল (স.) নিজেই ব'লে গিয়েছিলেন যে তার অনুসারিদের মধ্যে থাকবে ৭৩ টি দল, যার একটি দল সঠিক পথে, ৭২ টি দল বেঠিক পথেই থাকবে। আসলে তাঁর কথার তাৎপর্যটি আমরা খুব কমই অনুভব ক'রে থাকি। সঠিক পথে থাকার দল মাত্র একটি হবে। যদি সঠিক পথে থাকার দল দুইটি বা তিনটি হতো, তাহলে সেই দুইটি দল কিংবা তিনটি দলকে একত্রে একটি দল হিসেবেই বিবেচনা করা হতো, কারণ তারা সবাই সঠিক পথে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। এটি তাওহীদের রহস্য। যা হোক, গোটা মুসলিম জাতি সেই ১৪০০ বছর থেকে শুরু ক'রে এই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়েছে, এবং হচ্ছে। কিভাবে নামাজ পড়তে হয়, তখন নাভির উপরে না কি নিচে হাত বাঁধতে হয়, না কি বুকে হাত বাঁধতে হয়, নামাজে দাঁড়ানোর সময়ে দুই পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁকা রাখতে হয়, এই সব ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে উদ্ভূত তর্ক থেকে মারামারি এবং খুনোখুনিও লেগে যায়। দাঁড়ি রাখা না রাখা নিয়েও বিপুল গণ্ডগোল সংগঠিত হয় ব'লে আমরা দেখেছি।

আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদ মানব স্বভাবের একটি অংশ। বিচ্ছিন্নতাবাদ ঐক্য তথা তাওহীদের একেবারে উল্টো। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ অন্তরে কিভাবে এলো, তার উৎস কী, সেই বিষয়টি জানা খুব জরুরি। আমরা যখন আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, অর্থাৎ তার এবং আমাদের মাঝে প্রত্যক্ষতার বিপরীতে পরোক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই আমাদের মনের প্রতিটি পরস্পর-সংলগ্ন দু'টি যোগ্যতার মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, যেমন জ্ঞান বিশ্বাস থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এখন মানুষ অনেক জ্ঞান লাভ করার পরেও বিশ্বাসী হওয়ার

যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। আবার অনেকে এখনও রয়েছে যারা বিশ্বাসের নামে নিছক আন্দাজ কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা ইত্যাদির ওপর ভর ক'রে জগতে কাজকর্ম করে, জ্ঞানের তোয়াক্কা করে না। এই হলো একটি মাত্র উদাহরণ। আমাদের বর্তমান বইটি এই আলোচনার জন্য নয়। সুতরাং এই আলোচনা ইনশাল্লাহ অন্য কোথাও করা যাবে।

এইভাবে বিচ্ছিন্নতা বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে মানুষের ঐক্যের অনুভূতিতে। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য - এ কথা নিরুঙ্কুসভাবে স্বীকার করা এবং এই সত্যটিকে উপলব্ধি করার মতো যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা বড় ধরনের শত্রু না পেলে বড় ধরণের বন্ধুকেও খুঁজি না। এবং সে বন্ধুর মর্ম বুঝি না। আমরা দুঃখ না পেলে সুখের মর্ম বুঝি না। আমরা কষ্টে না পড়লে সুখে থাকার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হই। ইত্যাদি।

এভাবে আমাদের মনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি কিংবা জীবনের পরিস্থিতির যে দিকগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট, সেগুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিচ্ছেদ ঘ'টে গেছে, যেন আমরা আমাদের জ্ঞান চিন্তা কাজ বিশ্বাস সবকিছু দিয়ে এই বিচ্ছেদের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ঐক্যকে আবিষ্কার করি, এবং এক পর্যায়ে আমাদের সংকীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বভাব প্রবণতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হই। প্রকৃত মুক্তি হলো নিজের স্বভাবের হাত থেকে, আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মুক্তি। আধ্যাত্মিক অর্থে তা মুক্তি, এবং জাগতিক অর্থেও তা মুক্তি। মূলত কোনো মুক্তিই মুক্তি নয়, যদি তা আধ্যাত্মিক অর্থে মুক্তি না হয়। এ কারণে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা ব'লে থাকি যে, স্বাধীনতা অর্জন করা খুব সহজ কিন্তু তা রক্ষা করা খুব কঠিন। আমাদের স্বাধীনতা রচনার অধ্যায়টি ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করতে যে সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছি, এবং আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা

বিদ্যমান তা যদি পরিবর্তিত না হয় তাহলে যে আমাদের স্বাধীনতা আমাদের পরাধীনতায় রূপান্তিত হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। এই যুগে একটি দেশের দ্বারা আর একটি দেশকে যে নির্যাতিত হতে হবে, বা তার নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে হবে, এমনও কোনো কথা নেই। সেরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলেও পরাধীনতা সৃষ্টি হতে পারে - অর্থনৈতিক পরাধীনতা বা কালচার-নির্ভর পরাধীনতা, অজ্ঞতার অধীনতা, ঐক্যের অভাব, সহানুভূতি ও ধৈর্যের অভাব। এ সবই হলো পরাধীনতা। এ থেকে রেহাই পাওয়ার একটাই উপায় আছে - একতা বা তাওহীদ।

যৌক্তিক বিচারে তাওহীদ বোঝা অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়, কারণ তাওহীদ এমন একটি স্বাভাবিক বিষয় যাকে আমাদের যুক্তি সহজেই মেনে নেয়। বরং বহু-ঈশ্বরবাদ আমাদের যুক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, ফলে আমরা তা স্বাভাবিক ভাবেই অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু এই তাওহীদের ব্যকহারিক এবং বাহ্যিক রূপ এবং সেই রূপগুলির ভেতরে লুকায়িত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা খুবই কষ্টকর কাজ। একটি ছোট্ট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সবচেয়ে শুরুতে সৃষ্টি করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) কে। অর্থাৎ তাঁর নূরকেই প্রথম আলাহ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই নূর থেকে যাবতীয় বিষয়, বস্তু, জগৎ সবকিছুই সৃষ্টি হলো - বেহেস্ত–দোযখ সহ। সেই নূর থেকে কিন্তু আদমেরও সৃষ্টি, কারণ সেই নূর থেকে জগতের সবকিছুরই সৃষ্টি।

এবার আমরা সেই নূরের বিষয়টি ভুলে যাই। এবার আমরা শুরু করব আদম (আ.) থেকে। মানব জাতির আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমা শুরু হলো। (এখানে একটি কথা ব'লে নেওয়া ভালো: মানব জীবনটাই একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা, অন্য কিছু নয়।) আদম (আ.) এর বংশে অনেক নবী এলেন। এক পর্যায়ে সেই আদম সন্তানদের মধ্যে শেষ নবী

হিসেবে রাসুলে পাক (স.) জন্মগ্রহণ করলেন। যিনি ছিলেন সৃষ্টির শুরু বিন্দুতে, তিনি এলেন সর্বশেষ নবী হিসেবে। শুরু আর শেষ একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। এভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েই রইল।

আধ্যাত্মিক বিচারে আদম (আ.) রসূল (স.) এর নূর থেকে সৃষ্ট, অথচ জাগতিক নিয়মে রসূল (স.) আদম (আ.) এরই সন্তান। ভেতর আর বাহির একাকার হয়ে মিশে গেছে। জাহের ও বাতেন একাকার অবস্থায় রয়েছে। জ্ঞান ও অজ্ঞতা অন্য একটি বিষয়ের অধীনে প্লাবিত অবস্থায় রয়েছে। কী সেই বিষয় তা নির্দেশ করার জন্য আমাদের কাছে অন্য কোনো শব্দ নেই, তাওহীদ ছাড়া। তাওহীদকে বোঝা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কিন্তু যুক্তি দিয়ে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করতে পারা যায় যে তাওহীদই সত্য, এবং তাওহীদ ছাড়া আর যত মতবাদ রয়েছে, সবই মনগড়া কথা। আমরা যদি সঠিক আল্লাহর কাছ থেকে আগত কোনো নবীর সাক্ষাৎ না পেতাম, বা কোনো ধর্মগ্রন্থের সাক্ষাৎ না পেতাম, তাহলে হয়তো আমাদের মধ্যেই যারা ভালো মানুষ রয়েছেন, তারা একটি আল্লাহকে কল্পনা ক'রে সেই বরাত দিয়ে মানবজাতির উপকার করতে চাইতেন, যদি তা কেউ করতেন - জগতে আসলে এখনও এমন কাজ কেউ করেননি, কারণ আল্লাহ মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখেননি - তবুও তিনি একজন আল্লাহর কথাই বলতেন, কখনোই দুইজন বা তিনজন আল্লাহর কথা বলতেন না। কারণ তাওহীদ এবং আমাদের কমন সেন্স অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করে। কোনোরূপ বিদ্যাশিক্ষায় আমরা যদি জগতে পারদর্শী না হতাম, তবুও তাওহীদকে বুঝতে আমাদের কোনোরূপ সমস্যা হতো না। সবকিছুর মূল এক। সবকিছুই সেই একের দিকে ফেরত যাবে। ফলে এই মুহূর্তে যা কিছু আছে, তার মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাক না কেন, তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করছে, এবং ফলে গোটা মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতি আমার একটি দায়িত্ববোধ রয়েছে, আমি কখনোই সেই

দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না, এবং দায়িত্বহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করতে পারি না। এই বোধই তাওহীদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করবে এবং তাওহীদের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। নইলে আমাদের কোনো উপাসনা, কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখন আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাগতিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ করি। পৃথিবীতে যুগে যুগে যত যুদ্ধ, যত হিংসা-দ্বেষ, যত প্রতিযোগিতা সংগঠিত হয়েছে, সবই হয়েছে মানব জাতিরই দুই বা ততোধিক গোষ্ঠির মধ্যে। সবই সংগঠিত হয়েছে আদম (আ.) এর সন্তানদেরই মধ্যে। যদি সবাই মনে রাখতো যে তাদের বাবা এক, এবং সেই বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাদের থাকতো, তাহলে কখনোই মানব জাতি এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করত না; বরং মানব জাতির বিবর্তন ঠিকই ঘটতো, তবে সেই বিবর্তনের জন্য অন্য কোনো পথ খুলে যেত। আমরা জানি যে, জগতের প্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে। সেই থেকে শুরু ক'রে আমরা এখনও ভাই ভাইকে হত্যা করছি। আপনার আমার পর ব'লেই কেউ নেই। সুতরাং ভাই ছাড়া আপনি হত্যা করার জন্যে অন্য কাউকেই পাবেন না। এই কঠিন সত্য জেনেও আমরা সেই কাজই ক'রে চলেছি।

গোটা কোরআনে আল্লাহর এই তাওহীদমুখী ডাক বা সম্বোধন ভরপুর - হে মানব জাতি! হে আদম সন্তানগণ! হে বনি ইসরাইল! ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি যখন মানবজাতিকে ডাক দেন, তখন সেই ডাক আমরা কেউ শুনতে পারি বা না পারি, এমন কেউ বাকি থাকে না যার কাছে সেই ডাক পৌঁছায় না। অর্থাৎ তিনি কাউকে বাদ দিয়ে মানবজাতিকে ডাক দেন না। বরং মানবজাতিকে যখন ডাক দেন, তখন সবাইকেই তিনি সমান গুরুত্বে ডাক দেন। অন্য কথায়, আমরা এও বলতে পারি

যে, তিনি যখন গোটা মানবজাতিকে ডাক দেন, বা আদম সন্তানকে ডাক দেন, তখন তিনি এক আদমকেই শুধু ডাক দেন। আর কাউকে ডাকেন না। এ কারণে আল্লাহ পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে এও বলেছেন যে, গোটা মানব জাতির ধ্বংস হলো একটি মানুষকে ধ্বংস করার মতো এবং গোটা মানব জাতিকে আবার সৃষ্টি করা হলো একটি মাত্র মানুষকে সৃষ্টি করার মতো।

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।
(সূরা লুকমান, আয়াত: ২৮)

আমরা সৃষ্টি জগতেই তাওহীদের প্রকাশ দেখতে পাই। এবং আমাদের এখনকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, প্রকাশিত জগতে যদি কেউ তাওহীদকে সন্ধান না করতে পারে, তাহলে কোনো কাল্পনিক জগতে, আধ্যাত্মিক জগতে, চিন্তার জগতে তা স্বীকার করার মধ্যে কোনো গুরুত্ব নেই। গোটা মানবজাতি যে আমারই পিতা-মাতার সন্তান, এ যদি আমি ভুলে যাই, তাহলে আমরা যে আল্লাহর বান্দা, এ বিষয়টি ভুলে যাওয়ার চেয়ে তা কোনো অংশে কম অপরাধপূর্ণ হবে না। এখনও আমরা এমন ঘটনাও দেখি যে, এক মুসলিম দল অন্য দলের মসজিদে ঢুকে তাদেরকে হত্যা করছে, নির্যাতন করছে, বোমা মেরে সবকিছু উড়িয়ে দিচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টি দলের যে কোনো একটি তাওহীদের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, বা উভয় দলই তা থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে, মানবজাতি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী মতবাদ সৃষ্টি করে। ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। এবং নিজের ক্ষুদ্র অবস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। এইভাবে অল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর থেকে যে উপাসনা উঠে আসে, তা ধর্ম নয়। আমরা তাহলে কোরআনের আয়াত দেখি:

অন্য দলের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার ক'রে সেই নারীর মতো হয়ো না, যে সুতো মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার কাটা সুতো নষ্ট ক'রে দেয়। আল্লাহ তো এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে-বিষয়ে মতভেদ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তা তো পরিস্কার ক'রে প্রকাশ ক'রে দেবেন। সে বিষয়ে ওরা যা করে।

(সূরা হিজর, আয়াত: ৮৯-৯৩)

অমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ নুহকে দিয়েছিলাম, – যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে, –যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই ব'লে যে, 'তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো আর তার মধ্যে মতভেদ এনো না।' তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ তাদের কাছে তা বড় কঠিন ব'লে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মের দিকে টানেন, আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে তিনি ধর্মের পথে পরিচালিত করেন।

(সূরা শুরা, আয়াত: ১৩)

সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে এক-একজন সাক্ষী ওঠাব ও এদের বিষয়ে আমি তোমাকে সাক্ষী হিসেবে আনব। মুসলমানদের (আত্মসমর্পণকারীদের) জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে পথের নির্দেশ, দয়া ও সুখবর হিসেবে তোমার ওপর আমি আজ কিতাব অবতীর্ণ করলাম।

আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও

সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ করো। আর তামরা আল্লাহর নামে শক্ত প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভঙ্গ করো না। আল্লাহ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন।

অন্য দলের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার ক'রে সেই নারীর মতো হয়ো না, যে সুতো মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার কাটা সুতো নষ্ট ক'রে দেয়। আল্লাহ তো এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে-বিষয়ে মতভেদ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তা তো পরিস্কার ক'রে প্রকাশ ক'রে দেবেন।

(সূরা হিজর, আয়াত: ৮৯-৯২)

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রকাশিত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাওহীদকে আবিষ্কার না করতে পারলে সেই তাওহীদ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান, অনুমান, যুক্তি-তর্ক সবই বিফলতায় পর্যবসিত হবে। আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিকূলের মূলে যে তিনি নিজেই রয়েছেন, এ কথা যে স্বীকার করবে, তাকে এ কথাও মানতে বাধ্য হতে হবে যে, গোটা মানবজাতির এবং সৃষ্টিকূলের প্রতি তার কোনো না কোনো দায়িত্ব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সে দায়িত্ব মানসিক এবং শারীরিক অর্থে কষ্টকর নয় - খুবই সহজ। যেমন আমার পরিবার ছাড়া অন্য কোনো পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় না, যদি আমার অর্থনৈতিক ক্ষমতা খুব বেশি বেড়ে না যায়। আফ্রিকার দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে কতকগুলো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন কি না, এবং তাদের কষ্ট নিরসনের জন্য আমাকে এই মুহূর্তে অর্থসম্পদ নিয়ে ছুটে যেতে হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর

আসতে হবে আমার যোগ্যতা থেকেই। আমি যদি সেই কাজটি করার জন্য উপযুক্ত হয়ে থাকি, তাহলে ধ'রে নিতে হবে যে তা আমার দায়িত্ব, নইলে নয়। কিন্তু আমি যদি সব বিচারে সেই দুস্থ মানুষদের প্রতি আমার দায়িত্ব পালনে অক্ষম ব'লে বিবেচিত হই, তবুও একটি বিষয়ে আমাকে দায়িত্বহীন হলে চলবে না, এবং সেক্ষেত্রে আমি যদি দায়িত্বহীন হই, তাহলে আমি ক্ষমা পাবো না। কী সেই বিষয়টি? সেই বিষয়টি হলো শুভকামনা। আমি তাদের জন্য কিছু করতে না পারলেও, গোটা মহাবিশ্বের প্রতিটি জীব মানব পরিস্থিতি বস্তু সবকিছুর জন্য আমি শুভকামনা করতে পারি। আসলে আমাদের ক্ষমতা এত বেশি নয় যে আমরা কারো উপকার করতে পারি, কিংবা কারো ক্ষতি করতে পারি। সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই ঘটে। আমরা শুধু আমাদের অন্তরের শুভকামনার মধ্যে সবকিছুর ঐক্যকে উজ্জ্বল আলোর ঝলমল প্রকাশের মধ্য দিয়ে জাগিয়ে রাখতে পারি।

(শ্রবণশক্তি এবং প্রত্যক্ষতা)

আমাদের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি স্পর্শ শক্তি ইত্যাদি রয়েছে, যেগুলিকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব'লে থাকি। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হলো শ্রবণ শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন, এবং এই শক্তি যে সত্যকে জানার ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরে কতখানি প্রত্যক্ষতা সৃষ্টি করতে পারে, সে ব্যাপারে জানা। কিন্তু আমরা আলোচনা শুরু করব দৃষ্টি-শক্তি দিয়ে। কারণ, দৃষ্টি-শক্তির সঙ্গে শ্রবণ-শক্তিকে তুলনা করতে পারলে আমরা চমৎকার কিছু রহস্য আবিষ্কার করতে পারব, যা আসলে আমাদের অনেকেরই চোখে আগে কখনও পড়েনি।

আমরা যখন কোনো কিছু দেখি তখন তা দেখি। চোখের দৃষ্টি যদি খারাপ না হয়, বা আমাদের যদি কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে, তাহলে আমরা যা দেখি, সেই দেখায় স্বাভাবিক অর্থে কোনো ত্রুটি নেই বললেই চলে। কারণ, আমি যখন একটি চাঁদ দেখি, তখন আপনি যদি সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তবে আপনিও সেই চাঁদই দেখবেন। আমি যদি দেখি সেই চাঁদের পাশে এক টুকরো মেঘ রয়েছে, তবে আপনিও সেই এক টুকরো মেঘকেই দেখবেন। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিশক্তি আমাদেরকে কিছু কিছু সূক্ষ্ম বিষয় ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রে ফাঁকি দেয় না। দৃষ্টি শক্তির এই বক্রতাহীনতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ ক'রে দেয়। আমরা যখন বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তা থেকে এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করি যা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ হিসেবে আমাদের চোখে প্রবেশ করে। সেখান থেকে আমাদের মন সেই তথ্যগুলিকে সংগ্রহ ক'রে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু আমরা মনের কর্মকাণ্ডের দিকে এই মুহূর্তে নজর দিচ্ছি না, বরং আমাদের নজর আমাদের দৃষ্টিশক্তির দিকে।

এখন বিবেচনা করা যাক আমরা যা দেখি তা কেন দেখি, তা নিয়ে। ধরুন আপনি একটি ফুল দেখলেন। তাহলে আপনি কী দেখলেন? প্রশ্নটি শুনে অনেকেই হয়তো হাসছেন। ভাবছেন, ফুলকে দেখলাম মানেই তো ফুলটাকে দেখলাম। এ নিয়ে আবার দ্বিতীয় ধাপে প্রশ্ন করার কী প্রয়োজন রয়েছে? কিন্তু আমরা দ্বিতীয় ধাপে প্রশ্ন করছি এ কারণে যে, আমরা যখন ফুল দেখি, তখন ফুল দেখি ব'লেই যে ফুল দেখি, তা নয়। কারণ, অন্যান্য কিছু জিনিষ দেখি ব'লেই আমরা ফুলকে দেখতে পাই। সেই জিনিষগুলি হলো রং, আকৃতি, আকার ইত্যাদি। আকৃতি দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি তা ত্রিভুজের মতো না কি চতুর্ভুজের মতো, না কি অন্য কোনো জ্যামিতিক আকৃতির সমতুল্য ইত্যাদি। আর আকার বলতে বোঝাচ্ছি তা কি ছোট না কি বড় এই বিষয়গুলি। চোখ যখন বাইরের জগত সম্পর্কে কোনো তথ্য গ্রহণ করে তখন দৃষ্ট বস্তুর এই সব মাত্রা সম্পর্কে তা তথ্য গ্রহণ করে। এই মাত্রাগুলির তথ্য আমাদের চোখে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ফুলটি কি আমাদের চোখে প্রবেশ করে? পূর্ণাঙ্গ ফুলটির যে চিত্রটি আমাদের চোখে প্রবেশ করে সেই চিত্রটি মানেই হলো আকৃতি, আকার, রং ইত্যাদির সম্মিলন।

এখন একটু কল্পনার আশ্রয় নেয়া যাক। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে কল্পনাশক্তি দিয়েছেন। এই শক্তি আমাদের ভীষণভাবে উপকার করে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এই শক্তিটিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করি। ফলে, যে বিষয় থেকে আমাদের আলো পাওয়ার কথা ছিল, তা আমাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে দেয়। আসুন সেই কল্পনাশক্তিকে আমরা একটু ভালো কাজে ব্যবহার করি। কল্পনা করুন যে, আপনার শ্রবণশক্তি ব'লে কিছু নেই, কোনো কালেই ছিলো না। এভাবে কল্পনা করা একটু কষ্টকর বটে। কারণ শ্রবণশক্তি বিহীন অবস্থায় আপনি আসলে কখনওই ছিলেন না, তাই সে অবস্থায় নিজেকে বিবেচনা করা আসলেই কষ্টকর। তবুও আসুন আমরা কিছুক্ষণের জন্য ধ'রে নেই যে, আপনার শ্রবণশক্তি নেই। স্পর্শ শক্তি আছে, দৃষ্টি শক্তি আছে, বোঝার শক্তিও আছে। এবার আপনি আপনার চারপাশে যা কিছু ঘটছে তার দিকে তাকিয়ে পড়ুন। আপনি হয়তো দেখছেন যে একটি পাখি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, আপনার পাশ দিয়ে একটি গাড়ি ছুটে গেল, অদূরে একটি কুকুর ডাকছে ইত্যাদি। আপনি আপনার চোখ দিয়ে দেখে স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারবেন কোথায় কী ঘটছে। কেউ শব্দ করছে কিনা তাও আপনি বুঝতে পারবেন, কিন্তু সেই শব্দ আপনি শুনতে পাবেন না।

আপনার সামনে যখন একটি কুকুর ডাকছে তখন আপনি তার হা-করা থেকেই বুঝতে পারছেন যে সে শব্দ করছে কিন্তু আপনি তার সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। এভাবে কিছুক্ষণ কল্পনা ক'রে দেখুন। আসলে কুকুর ডাকলে যে সে হা করে, কিংবা সে হা করলে যে আমরা অনুমান করতে পারি যে সে ডাকছে, এই দুইয়ের সাথে আমাদের শ্রবণ-শক্তির একটি সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যদি আগে থেকে কুকুরের ডাক কখনও না শুনতাম তাহলে কান বন্ধ রেখে ডাকতে-থাকা কুকুরের দিকে তাকালে তার হা-মুখ থেকে আমরা কখনও অনুমান করতে পারতাম না সে ডাকছে কিনা। সেই অনুমানটি আমরা এই কারণেই করতে পারি যে, কুকুর ডাকলে যে সে হা করে, এই তথ্য আমাদের মস্তিষ্কে আগে

থেকেই রয়েছে। সুতরাং কান বন্ধ ক'রে আপনি যখন আপনার সামনে তাকিয়ে আছেন, তখন আপনি শব্দ সৃষ্টিকারী যে ঘটনাগুলো দেখছেন, সেই ঘটনাগুলি সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করছেন শুধু চোখের মাধ্যমে, কানের মাধ্যমে নয় - অথচ তা সত্ত্বেও সেখানে যে কানকেও ব্যবহার করা যেত সে ব্যাপারে অনুমান করতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না। কারণ এই জ্ঞানটি আপনার মধ্যে আগে থেকেই ছিল।

আবার বিষয়টি নিয়ে আমরা নতুন ক'রে একটু ভাবি। আপনার মস্তিষ্ক থেকে কোনো না কোনো ভাবে কিছুক্ষণের জন্য যদি শব্দ সম্পর্কিত যাবতীয় স্মৃতি মুছে ফেলা যেত, এবং ধ'রে নিলাম যে তার কারণে আমাদের দৃষ্টিশক্তির কোনো ক্ষতি হতো না, তাহলে ডাকতে-থাকা কুকুরটিকে দেখে আপনি শুধুই দেখতেন যে, একটি কুকুর হা করছে। কিন্তু তার সঙ্গে যে শব্দ সৃষ্টি করার একটি ঘটনা জড়িত রয়েছে, সে ব্যাপারে আপনার মাথায় কোনো অনুমান সৃষ্টি হতো না। কারণ শব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে যে কোনো সঞ্চিত স্মৃতিকেই আপনার মস্তিষ্ক থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিলুপ্ত ক'রে দেয়া হয়েছে। এবার আসুন আমরা আমাদের চোখ দুটিকে বন্ধ করি। শুধু কান দিয়েই আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতকে পড়ি। আমরা যেভাবে বই পড়ি, ঠিক সেভাবেই। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতকে প্রতিনিয়ত আমাদের চোখ কান জিহবা স্পর্শেন্দ্রিয় ইত্যাদি দিয়ে পড়ছি। প্রকৃতির এই বিশাল গ্রন্থকে আমরা প'ড়ে অনেকেই হয়তোবা খুব বেশি গূঢ় অর্থ উদ্ধার করতে পারছি না। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের কারোরই কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা এই বিশাল গ্রন্থটিকে পড়ছি, এই পঠন থেকে সংগৃহীত তথ্যকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে আমরা অনেক লুকানো সত্যকে আবিষ্কার করতে পারব। জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ যারা রয়েছেন, তারা তো এভাবেই জগত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। আর আমরা ঠিক

তাদের পথই অবলম্বন করব। কিন্তু আমাদের রয়েছে আরো কিছু পূর্ণাঙ্গ কলাকৌশল যা ব্যবহার ক'রে আমরা অদৃশ্যকে দেখতে চাই, অজানাকে জানতে চাই। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে, মানুষ পার্থিব জগতের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে অবগত কিন্তু পরকাল সম্পর্কে অমনোযোগী (সূরা রুম, আয়াত:৭)। এই কথাটির দুটি অংশ রয়েছে। মানুষ পার্থিব জগতের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে অবগত। এই অংশকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পার্থিব জগতের বাহ্যিক দিক ছাড়াও লুকায়িত গোপন কিছু দিক রয়েছে। এবং পরবর্তী অংশের সঙ্গে আমাদের এই আবিষ্কৃত তথ্যকে যদি আমরা মিলাই, তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে, পার্থিব জগতের লুকায়িত দিক গুলোকে জানলেই সেই জানা মানে মূলত পরকালকেই জানা। সুতরাং এই আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের একটি চাবি লুকিয়ে রয়েছে। আমরা ঠিক এই পথ অবলম্বন করতে চাই। আল্লাহ আমাদেরকে চক্ষু কর্ণ দান করেছেন। এগুলির মধ্যে বিপুল শক্তির সম্ভাবনা নিহিত আছে, তা পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে শুধু একবার নয়, বহুবার বলা হয়েছে। আসুন আমরা কিছু আয়াত দেখি:

বলো, 'কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনের উপকরণ সরবরাহ করেন, বা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত থেকে জীবিত বের করেন আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন?' তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

(সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১)

আমি কি তাকে দুটো চোখ, জিহ্বা আর ঠোঁট দিই নি?

(সুরা বালাদ, আয়াত: ৮-৯

আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে

শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(সূরা নাহ্ল, আয়াত: ৭৮)

যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তা অনুসরণ কোরো না। কান, চোখ, মন প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে।

(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত: ৩৬)

এই আয়াতগুলি থেকে আমরা আমাদের চক্ষু কর্ণ স্পর্শেন্দ্রিয় এবং চিন্তাশক্তি ইত্যাদির বিপুল গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পারছি। কোনো কিছুর গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পারা মানেই সেই জিনিষটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারার অন্তত অর্ধেক যোগ্যতা অর্জন ক'রে ফেলা। আপনি যদি কোনো কিছুকে তার সঠিক গুরুত্বে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা হয়তো আপনার জীবনে খুব বেশি কাজে লাগবে না। তাহলে আসুন আমরা আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করি। শুধু তাই নয়, এই ইন্দ্রিয়গুলির সীমাবদ্ধতাকেও আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ যে কোনো শক্তির সীমাকে আমরা যখন জেনে ফেলি, তখন তার চেয়ে বৃহত্তর একটি শক্তির সন্ধান আমরা পাই।

এখন আমরা একটি সাড়া জাগানো প্রশ্ন করতে পারি। আমরা যা দেখি, তা কি চোখের মাধ্যমে না দেখে কান দিয়ে শুনতে পারতাম? কিংবা আমরা যা শুনি তা কি কানের মাধ্যমে না শুনে চোখ দিয়ে দেখতে পারতাম? এই প্রশ্নটির জবাব আমরা এই মুহূর্তে অনুসন্ধান করছি না। বরং একটু পরেই ইনশাল্লাহ আমরা ভালোভাবেই জানবো কেন প্রশ্নটি করেছি। এই প্রশ্ন দুটির পেছনের কেন কে যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে আমরা জানতে পারব চোখ যা দেখে এবং কান যা শোনে, তা কেন অর্থপূর্ণ হয়।

আমরা একটু আগে দেখেছি যে, আমাদের কান বন্ধ ক'রেও যদি আমরা আমাদের পরিবেশের দিকে চোখের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করতাম তাহলে সেই তথ্যের মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকত যা থেকে আমরা বুঝতে পারতাম যে আমাদের কানটিকেও ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কুকুর ডাকার উদাহরণটি দিয়েছিলাম। কুকুর যখন ডাকে তখন তার যে ভঙ্গি সৃষ্টি হয়, সেই দেহ-ভঙ্গি যদি আমরা দেখি, তাহলে ঐ মুহূর্তে আমাদের কান বন্ধ থাকলেও আমরা বুঝতে পারি যে কুকুরটি ডাকছে। এই হলো আমাদের দৃষ্টিশক্তির সাথে আমাদের শ্রবণ-শক্তির সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান থেকেই আমরা বিষয়টিকে অনুমান করতে পারি। ঠিক একই ভাবে, আমরা যখন চোখ বন্ধ ক'রে থাকি, এবং আমাদের আশেপাশে কোনো কুকুর ডেকে উঠলে যখন আমরা তা শুনতে পাই, তখন আমাদের চোখের সামনে সেই কুকুরের একটি আনুমানিক প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। আমরা কুকুরের ডাক শুনে কখনোই কল্পনায় গরু বা ছাগলকে দেখি না। ফলে এখানেও আমরা ঠিক একই বিষয় আবিষ্কার করছি। কান দিয়ে আমরা শব্দ শক্তির মাধ্যমে যে তথ্য গ্রহণ করি, সেই তথ্য নিজে পূর্ণাঙ্গ নয়, তার সঙ্গে চোখ দিয়ে আমরা যে তথ্য গ্রহণ করি, এবং স্পর্শ দিয়েও আমরা যে তথ্য গ্রহণ করি, তারও সংযোগ রয়েছে। এ কারণে শুধু কান দিয়ে আমরা যে তথ্য গ্রহণ করি, সেই তথ্য অন্যান্য যাবতীয় তথ্যের স্মৃতিকে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দেয়। এভাবে আমাদের ভিতরে একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা তৈরি হয়। এটি হলো বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বাস্তবতার এই প্রতিচ্ছবি কোনো তথ্য নয়, বরং তা বিবিধ তথ্যের পূর্ণাঙ্গ সমাহার - যাকে আমরা জ্ঞান বলতে পারি।

আমরা চোখের মাধ্যমে আলোক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট সংকেত বা তথ্য গ্রহণ করি এবং কানের মাধ্যমে গ্রহণ করি শব্দশক্তির দ্বারা সৃষ্ট তথ্য। আমরা স্পর্শের মাধ্যমে ঘর্ষণ দ্বারা সৃষ্ট তথ্য গ্রহণ করি। আমরা আমাদের

নাকের মাধ্যমে ঘ্রাণ সম্পর্কিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তথ্য গ্রহণ করি। এভাবে আমরা আমাদের বাহ্যিক জগতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করি। কিন্তু বাহ্যিক জগত এমনই এক জগত, যার প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তু তথা অংশ বাস্তবতারই একটি অংশ। ফলে তা থেকে যখন আমাদের অন্তরে তথ্য প্রবিষ্ট হয় তখন সেই তথ্যের কিছু অংশ চোখ দিয়ে, কিছু অংশ কান দিয়ে, কিছু অংশ স্পর্শ দিয়ে, কিছু অংশ নাক দিয়ে, কিছু অংশ জিহবা দিয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং তার পরেই আমরা বাইরের বাস্তবতাটির একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের মধ্যে গঠন করতে পারি। আমাদের মনের রয়েছে সঞ্চয় করার যোগ্যতা। সেই যোগ্যাতার কারণে সেই প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এভাবে আমরা আমাদের চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্যামেরার মতো ব্যবহার করি। এই ক্যামেরাটি আমরা সচরাচর 'ক্যামেরা' শব্দটি দিয়ে যাকে বুঝি তার চেয়েও বেশি পূর্ণাঙ্গ। কারণ যান্ত্রিক ক্যামেরা কেবল দৃশ্যকে ধারণ করতে পারে, কিন্তু আমাদের এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্যামেরা পুরো বাস্তবতাকেই ধারণ করতে পারে। এভাবে একটু বিবেচনা ক'রে দেখলেই দেখা যাবে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় কত শক্তিশালী, এবং এগুলি যে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের কতখানি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এ জন্যে আল্লাহ তাঁর পাক কালামে বলছেন যে তিনি আমাদেরকে চক্ষু কর্ণ অন্তঃকরণ ইত্যাদি দান করেছেন।

আমরা একটু আগে দেখলাম যে, আমাদের চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য আমাদের অন্তঃকরণে পৌছায় এবং আমাদের অন্তঃকরণই সেই তথ্য লাভ করার পর বাস্তবতার একটি চিত্র নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। তাহলে আমরা আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য অনুভব করতে পারছি এবং চক্ষু কর্ণ যে আমাদের জন্য একটি অতুলনীয় উপাদান সে ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্টভাবে কোরআনে বলেছেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের অন্তঃকরণ হলো সত্যেকে দেখার আয়না। অন্তঃকরণে যে ছবি ভাসে, তা মূলত সত্যেরই ছবি। তবে আমাদের এই আয়নার মধ্যে প্রথমে যে তথ্যগুলি আপতিত হয় সেগুলি বাইরের জগত থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি আমাদের চোখ কান ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, এবং সচরাচর আমরা এই আয়নার মধ্যে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-লব্ধ তথ্যগুলি অনুসন্ধান করি। ফলত অন্তঃকরণের সঙ্গে আমাদের খুব কম দেখা হয়।

অন্তঃকরণের সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাদেরকে চোখ কিভাবে দেখছে তাও দেখতে হবে। কান কিভাবে শুনছে তাও দেখতে হবে। অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির পেছন থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে পড়তে হবে। তাহলে হয়তো অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে পারব। শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি ইত্যাদির সীমাবদ্ধতাগুলিকে আবিষ্কার করতে পারব। যে শক্তির দ্বারা আমরা চলাফেরা করছি, সেই শক্তির সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করা মানে সেই সীমাবদ্ধতা যে আবিষ্কার করলো তার সন্ধানে রত হওয়া। এই সীমাবদ্ধতা যে আবিষ্কার করবে তার ক্ষমতা নিশ্চয়ই এই পঞ্চেন্দিয়ের ক্ষমতার চেয়ে বেশি। নইলে তার কাছে এই সীমাবদ্ধতা ধরাই পড়তো না। কে সে? সে হলো আমাদের অন্তঃকরণ।

সুতরাং আমাদেরকে একটু বিপরীত দিক থেকে ভাবতে শিখতে হবে। অধিকাংশ মানুষের ভাবনার সূত্র এবং উপায় মূলত এক। তবে কারো ভাবনা সোনার ফসল ফলায়, কারো ভাবনা নিছক কল্পনায় পর্যবসিত হয়। এর কারণ হলো এই যে, যে স্থান থেকে যে বিষয়টির ভাবনা শুরু করতে হয় আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিষয়টির ভাবনা সেই স্থান থেকে শুরু করতে ব্যর্থ হই। ফলে আমাদের ভাবনাগুলি এমন জায়গায় গিয়ে শেষ হয়, যেখানে আমাদের জন্য বড় ধরনের কোনো সার্থকতা অপেক্ষা করে না। তাহলে আসুন আমরা উল্টো দিক থেকেও দেখি।

আমরা অনেকেই ছোট বেলায় ভূত দেখেছি। বিশেষ ক'রে আমরা যখন গ্রামে লালিত-পালিত হয়েছি, তখন কোনো না কোনো একদিন কোনো না কোনো এক ঝোপের মধ্যে আমাদেরকে ভূত দেখতে হয়েছে। না দেখা সম্ভব হয়নি। এবং যেহেতু আমরা তা দেখেছি, সেহেতু আমরা তার ভয়ে জীবনের একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভীত হয়ে থেকেছি। আমাদের শিশুকালে যতগুলি মানসিক অবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভয়। শিশুদের বৈশিষ্ট্যই যেন ভয় পাওয়া। এই ভয়ই আমাদের অন্তরের একটি অবস্থা অর্থাৎ চিত্র। সেই চিত্র আমাদের অন্তরে স্থির হয়ে আছে, এবং তার দ্বারা আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রভাবিত হয়েছে। ফলে বাইরে ভূত নামক কোনো কিছু না থাকা সত্ত্বেও আমরা তা দেখেছি। শুধু তাই নয়, এমন ঘটনাও আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে যে, আমি ভূত দেখেছি অথচ আশেপাশে যারা রয়েছে তারা তা দেখেনি। এ এক বিশাল যোগ্যতা। চোখের যোগ্যতায় এ কাজ সম্ভব হয়নি। তা যদি হতো, তাহলে একটু আগেই আমরা যা আবিষ্কার করেছি সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমরা বলতে পারতাম যে, চোখের ক্ষমতা যেহেতু সবার একই রকমের, সেহেতু সম্মিলিতভাবে আমাদের চোখে কখনও ভুল হবে না। এবং তা হয়ও না। এই বিষয়টি বোঝার জন্যই আমরা শুরুতেই বস্তুজগতের কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্পষ্ট যোগাযোগের কথা বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে, আমি যখন চাঁদ দেখি, তখন আমার চারপাশে আর যারা রয়েছে তারাও ঠিকই চাঁদ দেখবে। এবং সেই চাঁদের পাশে এক টুকরো মেঘ থাকলে সবাই সেই এক টুকরো মেঘকে দেখবে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের এক এক জনের চোখ এক এক ভাবে কাজ করছে না, বরং সবার চোখ একই পদ্ধতিতে কাজ করছে। ফলে তারা একই তথ্যকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে পারছে। কিন্তু আমাদের এক এক জনের মন একই পদ্ধতিতে কাজ করে না, বরং কাজ করে এক এক উপায়ে। এর অনেক কারণ রয়েছে। সে কারণে

আমরা এখন প্রবেশ করতে চাই না। বরং আমরা খুব সহজেই ধ'রে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবো যে, আমাদের মনের মধ্যে যা কোনো না কোনো কারণে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আমাদের চোখ কান ইত্যাদি তার দ্বারাও প্রভাবিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চোখের নিজস্ব যোগ্যতার কারণে আমরা দেখি না, বরং মন যা দেখতে চায় তাই-ই দেখি। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কানের নিজস্ব যোগ্যতার কারণে শুনি না, বরং মন যা শুনতে চায় তাই শুনি।

এমন অনেক ঘটনা আমাদের অনেকের মধ্যেই হয়তো ঘটেছে যে, আমরা যাকে অপছন্দ করি বা যে ব্যক্তি আমাদের জন্য কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিকর ব'লে আমরা মনে করি, সে যখন একটু দূরে অন্য আর দুই পাঁচ জনের সাথে কথা বলছে, এবং একটু গোপনীয়তা অবলম্বন করছে, তখন আমরা ধ'রে নেই যে, হয়তো বা সে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলছে। এবং সেই কথার অল্পস্বল্প কিছু ধ্বনি আমাদের কানে এলেও আমরা এমন কিছু শুনি যা আমাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে যায়, যদিও সেই জাতীয় কথা সেখানে আদৌ উচ্চারিত হয়নি। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, কখনও কখনও আমাদের মন যা শুনতে চায় আমাদের কান তাই-ই শোনে। এই জাতীয় ক্ষেত্রগুলিতে এসে আমরা চোখ থাকতেও দেখতে ব্যর্থ হই, কান থাকতেও শুনতে ব্যর্থ হই। অন্তঃকরণের এই বিষয়টিকে আমরা আবিষ্কার করতে চাই। নইলে চোখ থাকতেও আমাদেরকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে, কান থাকতেও বধির।

প্রিয় পাঠক! আপনি নিজেই একটি ছোট্ট গবেষণা করতে পারেন, এবং তার ফল আপনি কী পাবেন তা আগে থেকেই আমরা ব'লে দিচ্ছি। তার ফল আপনি নিজের গবেষণার মাধ্যমে যখন লাভ করবেন, এবং সেই ফল যখন আমাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তখন আমাদের

কথাগুলো আপনার কাছে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থময় ব'লে মনে হবে। আপনি দশজন বা পাঁচজন শিশুকে একটি শ্রেণী কক্ষের মতো জায়গায় নিমন্ত্রণ করুন এবং একটি বোর্ডে তাদের সবাইকেই একটি পাখি আঁকতে বলুন। তারা যেটুকু যা আঁকতে পারে সেটুকুকেই সঠিক ধ'রে নিয়ে তাদের অঙ্কিত বিষয়কে বিবেচনা করুন। কারো অঙ্কণ ভালো কারো অঙ্কণ খারাপ হতে পারে, সেটি প্রতিভার বিষয়। প্রতিভা একটি বিশেষ জিনিষ। কোনো সাধারণ জিনিষ নয়। সাধারণ জিনিষ হলো আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং আমাদের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক কাজকর্ম। এই সব ক্ষেত্রগুলিতে কেউই কারো থেকে আলাদা নয়। আপনি দেখবেন যে, সবাই পাখিকে বোঝাতে গিয়ে এমন কিছু ছবি আঁকছে যা থেকে আমাদের বুঝতে বেশি কষ্ট হয় না যে, সে হয় কবুতর না হয় দোয়েল এই জাতীয় পাখি আঁকছে। এভাবে আপনি সবাইকে একটি ক'রে গাছ আঁকতে বলুন। দেখবেন সবাই আঁকছে হয় বটগাছ না হয় এমন স্কেচিং করছে যা থেকে মনে হয় গাছটি আম গাছ না হয় আপেল গাছ। অর্থাৎ গাছগুলির উপরি-কাঠামো বা সার্বিক চিত্র মোটামুটি একই ধরনের। তখন আপনি নিজেকে এই প্রশ্নটি করতে পারবেনঃ তারা পাখির নামে একটি বিশেষ ধরনের পাখির চিত্র কেন এঁকেছে? উট পাখি, এমু পাখি, ময়ুর ইত্যাদি পাখি - এরা কী দোষ করল? আপনি গাছের ক্ষেত্রেও নিজেকে এই প্রশ্নটি করতে পারবেন। খেজুর গাছ, তাল গাছ - এসব গাছও তো সবার অতি পরিচিত। এগুলো তারা কেন আঁকেনি?

আপনি এখন সবাইকে একটি তারকা আঁকতে বলুন। সবাই একটি তারকার প্রতীক আঁকবে, যা আসলে আদৌ তারকার মতো নয়। তারকাকে আমরা মোটামুটি গোলাকার হিসাবেই চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু যেভাবে আমরা তারকা আঁকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তারকা আদৌ তার মতো নয়।

আমাদের প্রশ্ন হলো, কেন কাউকে তারকা আঁকতে বললে সে ঐ জাতীয় প্রতীককেই বারবার অঙ্কিত করে? আসলে, আমরা যখন কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি, তখন ঐ বিষয়ের যাবতীয় দৃশ্যপ্রধান বা শ্রুতিপ্রধান তথ্য আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে। তবে ঐ বিষয়ের সাধারণ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক একটি চিত্র আমাদের মনে প্রস্তুত থাকে। যেমন, যখনই কাউকে গাছের কথা বলা হয় তখনই সে কাগজে বা বোর্ডের ওপর আঁকতে গেলে সচরাচর বটগাছই আঁকবে। এই বটগাছই হলো আসলে আমাদের অন্তরে গাছ সম্পর্কিত যত ধারণা রয়েছে তার প্রতিনিধিস্থানীয়। কৃষ্টিকালচার ভেদে এই প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বিশেষ কোনো কালচারে এই প্রতিনিধির স্থানীয় জ্ঞান যেভাবে স্থির হয়ে আছে, ঠিক সেভাবেই স্থির থাকতে চায়। আমরা যখন কারো কথা শুনি বা কোনো কিছু দেখি, তখন আমাদের মনের মধ্যে আগে থেকে সঞ্চিত এই প্রতিনিধিস্থানীয় জ্ঞানের সঙ্গে সেই বিষয়টিকে তুলনা করি। এভাবে আমরা কোনো বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করার মাধ্যমে সেই বস্তুটিকে চিহ্নিত করতে পারি।

আমাদের মনের এই সঞ্চিত জ্ঞান যাকে স্কীমা (schema; বহুবচনে schemata) বলা হয়, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ ক'রে দেয়। এই স্কীমা না থাকলে প্রতিটি দৃষ্টিপাতের সঙ্গেই আমাদেরকে কোনো কিছু নতুন ক'রে দেখতে হতো। প্রতিটি শ্রবণ কার্যের সঙ্গেই আমাদেরকে নতুন ক'রে কোনো কিছু শুনতে হতো। কিন্তু এই স্কীমার অস্তিত্বের কারণে আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত ঘটনাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। যেমন, আমরা যখন ফুটবল খেলতে নামি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ফুটবল খেলা সম্পর্কিত শব্দগুলি এবং ঘটনাগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে খেলারত অবস্থায় কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো অস্পষ্ট কথা বললেও তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।

কিন্তু আমরা যখন খেলায় রত অবস্থায় থাকি না, তখন কিন্তু সেই সম্পর্কে কোনো অস্পষ্ট কথা বললে আমাদেরকে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার শোনার জন্য বক্তাকে অনুরোধ করতে হবে - কী বললে? শুনতে পাইনি। ইত্যাদি। আমাদের মন যখন তার সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিনিধিগুলোকে সক্রিয় ক'রে তোলে, তখন আমরা আসলে যা শুনি তা ঐ জ্ঞান থেকেই শুরু হয়, আমরা যা দেখি তা আমাদের ঐ জ্ঞান থেকেই শুরু হয়। এ কারণেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ হয়, প্রতিটি কথা বলার আগে আমাদেরকে গভীর ধ্যানে ব'সে বাক্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু এই স্কীমার অন্যদিকটিও দেখার দরকার রয়েছে। স্কীমার উপস্থিতির কারণে যে সব ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস বেশি প্রখর এবং বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, এবং বিশেষ ক'রে আমাদের অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার সঙ্গে বা আতঙ্কের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়, সে সব ক্ষেত্রে আমরা আসলে বাইরের কোনো কিছু দেখার আগেই ঐ বিষয়ে আমাদের অন্তরের যে ধারণা রয়েছে, সেটাকেই আগে দেখি। ফলে দেখা ব'লে যা বোঝায় তা আর ঘটে না। আমরা দেখার আগেই দেখি, শোনার আগেই শুনি। তাই আমরা কেবল অতীতকেই দেখি। কারণ, আমরা যা দেখি তা অতীতে অর্জনকৃত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সমষ্টি হিসেবে আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল। ফলে বর্তমানকে দেখার যোগ্যতা আমরা সচরাচর পাই না। এই স্কীমার কারণে আমাদের সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়। আমরা যা দেখে ফেলেছি তার বাইরে আমাদের নজর পৌঁছাতে চায় না। অর্থাৎ আমরা যা একবার দেখে ফেলেছি তা না দেখার যোগ্যতাও আমাদের হয় না। কাফেরগণ রসূল (স.) এর কথা অনেক সময় শুনত, বিশেষ ক'রে মোনাফেকগণই তা বেশি করত, এবং তারা যখন তাঁর কথা শুনত তখন তার মুখনিঃসৃত বাণী তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতো না। বরং তারা

মুহম্মদ (স.) এবং ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছে সেই ধারণার কানই পেতে থাকত। ফলে সেই ধারণার বাইরে তারা কিছু শুনতে পেত না। অর্থাৎ তাদের স্কীমাই তাদের শ্রবণশক্তিকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল। এ কথা আল্লাহ কোরআনে স্পষ্টভাবে বলছেন, যা দেখলে আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, আমাদের স্কীমা আমাদের উপকার করলেও, তাই-ই আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হয়। কারণ আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানই আমাদের চোখের এবং কানের পর্দা হিসেবে কাজ করে। একটি সীমার পরে আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসই আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এবং তখন আমরা সত্যকে দেখার, বোঝার, শোনার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলি। সে ক্ষেত্রেই আল্লাহ বলছেন যে, তাদের অন্তরে আবরণ প'ড়ে গেছে। তারা চোখে দেখে না, কানে শোনে না, ইত্যাদি। আসুন তাহলে আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলি দেখি:

> *আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না - এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও ভ্রষ্ট। এরাই অবহেলাকারী।*
>
> *(সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৭৯)*

> *তুমি যদি তাদেরকে সৎপথে ডাক তবে তারা শুনবে না। আর তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা দেখে না।*
>
> *(সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৯৮)*

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও।

(সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৩)

আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর খাড়া করেছি এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।

(সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৯)

জাতির পরম্পরায় যারা দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটা কি মনে হয় নি যে আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি ও তাদের হৃদয় মোহর ক'রে দিতে পারি যাতে তারা শুনতে না পায়?

(সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০০)

আরো গভীরে প্রবেশ করার আগে আমরা চোখের এবং কানের যোগ্যতার মধ্যে, এবং এই দুই যোগ্যতার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, যে পার্থক্য রয়েছে, তা আর একটু বিবেচনা করি। আমি যদি আপনাকে বলি, দেখুন আকাশে চাঁদ রয়েছে। আপনি হয় তো ঘরের মধ্যে রয়েছেন। আপনি বলছেন, কই দেখি তো! এ কথা ব'লে আপনি বের হয়ে এলেন এবং তাকিয়ে দেখলেন যে আকাশে চাঁদ রয়েছে। তাকিয়ে দেখার আগেও কিন্তু আপনি হয়তো আমাকে অবিশ্বাস করেননি। কারণ, এখন রাতের বেলা। পূর্ণিমার রাত। এবং আমি মুখে যে কথাটি বলেছি বাস্তবতার সঙ্গে তার খুব বেশি পার্থক্য খোঁজার প্রয়োজন হয় না। কারণ পূর্ণিমার রাতে যে আকাশে চাঁদ থাকবে, এ বিশ্বাস আপনার আগে থেকেই রয়েছে। ফলে ঘর থেকে যদি আপনি বের হয়ে না-ও আসতেন, তবুও আপনি ধ'রেই নিতেন যে আকাশে চাঁদ রয়েছে। কিন্তু আমরা যখন কারো কথা শুনি, চোখে দেখার সুযোগ যদি সেখানে না থাকে তখন কিন্তু যা শুনলাম তা সত্য কিনা তা নিয়ে

ভাবতে বসি। আপনি যখন চাঁদ দেখলেন, তখন আপনার দেখা ঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়ে আপনি ভাবতে বসেন না। কারণ আপনি যখনই দেখলেন তখনই আপনার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আপনি যা দেখেছেন তা সত্য। কিন্তু আপনাকে আমি যখনই একটি তথ্য দিলাম, আপনি তা কানের মাধ্যমে শুনলেন। কোনো না কোনো কারণে আপনার কাছে হয়তো সেই তথ্যটি গ্রহণযোগ্য হলো না। আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কানের মধ্যে সন্দেহকে জাগিয়ে রেখে চিন্তায় ব'সে গেলেন, যা শুনলেন তা আদৌ সত্য কি না।

চোখের কাজ হচ্ছে দেখা। দেখার কাজ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করতে পারি যে, আমরা দেখে ফেলেছি। একই ভাবে, কানের কাজ শোনা। অথচ সেই শোনার কাজ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করতে পারি না আমি যা শুনেছি তা সত্য কিনা। সেই সত্যতাকে নির্ণয় করার জন্য আমাকে আরো অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়, এমন কি চোখেরও সাহায্য নিতে হয়। যেমন, আমি হয়তো আপনাকে বললাম যে একটি ঘোড়া আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনি দূর থেকে কান দিয়ে আমার কথা শুনলেন। আমার কথায় আপনি আস্থা রাখতে পারলেন না। কারণ আপনার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যখন আপনি দেখতে পেয়েছেন যে একটি ঘোড়া আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। ফলে আপনার অভিজ্ঞতায় এবং জ্ঞানে সেই বিষয়টি সঞ্চিত নেই। শুধু যে সঞ্চিত নেই তা নয়, আপনার বিচার বুদ্ধিতেও সেই বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়ে গেছে। ফলে আপনি আমার কথা শোনা সত্ত্বেও আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমি হয়তো দুই তিন বার ক'রে একই কথা বললাম এবং তখন আপনি দৌঁড়ে ছুটে এলেন এবং বললেন, কই দেখি তো!

আমার কথার চেয়ে আপনি আপনার চোখের গুরুত্ব বেশি দিয়ে ফেললেন। কারণটা কী? কারণ হলো এই যে, আপনি যা শুনেছেন তা সত্য কি না তা যাচাই করার জন্য আপনাকে আপনারই চোখের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা কানের মাধ্যমে যে তথ্য গ্রহণ করি, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ নয়। সেই তথ্যের সত্যতা যাচায়ের এর জন্য আমাদেরকে চোখেরও সাহায্য নিতে হয়। মূলত এভাবে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আমাদেরকে যে তথ্য দান করে, সেগুলি বাস্তবতার সম্পূর্ণ আলাদা এবং মৌলিকভাবে বিচ্ছিন্ন মাত্রাগুলি সম্পর্কে। তাই একটি মাত্রা থেকে আহরিত তথ্যের দ্বারা অন্য একটি মাত্রাকে আহরিত তথ্যের সত্যতাকে যাচাই করতে পারলে আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, আমরা যে তথ্য গ্রহণ করেছি তা সত্য। কারণ আমরা যে তথ্য গ্রহণ করেছি তা যদি মিথ্যা হতো, তা হলে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই তথ্য গ্রহণ করেছি সেটি বাদে অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই বিষয়ে অন্যান্য তথ্য গ্রহণ করতে পারতাম না। একমাত্র সত্য বা বাস্তবতারই যাবতীয় মাত্রা থাকা সম্ভব, যেগুলির মাধ্যমে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা তথ্য গ্রহণ করি।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো খোলাসা করা যাক। ধরুন, আপনি ভূত দেখলেন। কোনো না কোনো কারণে আপনি ভূতকে সত্যিই দেখলেন। ঐ সময়ে আপনি ভয় পেলেন ব'লে আপনার চোখ ছাড়া বাকি ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করল না। ফলে আপনি আপনার চোখকে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু আপনার ভয় যখন কেটে গেল তখন আপনার পাঁচটি ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে উঠল এবং আপনি চোখে যা দেখেছিলেন, সেই বিষয়টি আপনার মস্তিষ্কে যেভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে, তাকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত তথ্যের দ্বারাও বিচার করতে চাইলেন। তখন আপনি দেখলেন যে আপনি চোখ দ্বারা যে তথ্য গ্রহণ করেছেন সেই তথ্য অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত তথ্যের আলোকে সত্য

হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে না। এভাবে আপনি মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে পারলেন।

অর্থাৎ একত্রে সবগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য আহরণ করতে ব্যর্থ হই, তখন সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। একমাত্র বাস্তবতা থেকেই এমন তথ্য আসা সম্ভব যা আমাদের সবগুলি ইন্দ্রিয়ের দাবি মেটাতে পারে। কোনো কল্পনা বা কোনো মিথ্যা থেকে সেই তথ্য আসা সম্ভব নয়।

যা হোক, আমরা আবার আমাদের স্কীমার আলোচনায় ফিরে যাই। আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ধারণাগুলো কখনও কখনও এত প্রবল হতে পারে, যা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাগুলিকে সংকীর্ণ বা দুর্বল ক'রে দিতে পারে। ফলে আমাদের অন্তরের ওপর একটি পর্দা প'ড়ে যায়। এই পর্দাই আমাদের কাছ থেকে সত্যকে আড়াল ক'রে রাখে, যেমন মেঘ আড়াল ক'রে রাখে পূর্ণিমা রাতের পূর্ণাঙ্গ উজ্জ্বল চাঁদকে। এ কারণে আমাদেরকে সঠিকভাবে দেখতে শিখতে হবে। এবং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো শুনতে শেখা। কারণ আমরা আগেই বিবেচনা ক'রে দেখেছি যে, দেখার মধ্যে ভুল খুব কম হয়ে থাকে, বরং শোনার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যে কারণে আমাদের শ্রবনশক্তির ওপরে আমাদের যতটা বিশ্বাস, তার চেয়েও বেশি বিশ্বাস আমাদের চোখের ওপর। তাই আমরা কোনো কিছু শুনলে তা যদি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তখন তা যাচাই করার জন্য আমরা আমাদের চোখকে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অভিযোগ করেছেন যে, মানুষের অধিকাংশই কথা শোনে না। তারা কানে শুনতে পায় না, এ কথাও তিনি বলেছেন। আবার তিনি এও বলেছেন যে, তারা কানে শুনলেও সেই শ্রবণশক্তি

তাদেরকে আসল শ্রবণ দান করে না। এই দুটি স্তরেই তিনি আমাদেরকে চমৎকার তথ্য প্রদান করেছেন।

আমরা শ্রবণ সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। আমরা প্রায়ই ব'লে থাকি যে, আমাদের ছোট ভাই-বোন বা ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ হয়তো আমাদের কথা শোনে না। আমাদের কথা তাদের কানে পৌঁছায় না, তা নয়। কিন্তু আমাদের কথায় কোনো আদেশ বা নিষেধ থাকলে তা তারা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে না। ফলে আমরা যখন কোনো কথা বলি তখন সেই কথা তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়, আর তাই আমরা বলি যে তারা আমাদের কথা শোনে না। এটিও আসলে শ্রবণশক্তির একটি অংশ। অন্তরে আত্মসমর্পণ না থাকলে, অর্থাৎ কোনো আদেশ বা নিষেধ আমরা শ্রবণ করলে তা যদি পালন করার মানসিকতা আমাদের মধ্যে না থাকে, তখন বিষয়টি আসলে এরূপই দাঁড়ায় যে, সেই বিষয়টি আমরা এখনও শ্রবণই করতে শিখিনি। বিশেষ ক'রে কোনো তথ্য-সমৃদ্ধ কথা যখন আমরা শ্রবণ করি, তখন তা থেকে আমরা তথ্য গ্রহণ করি, এবং সেই তথ্যকে স্মৃতিতে সঞ্চিত ক'রে রাখি। কিন্তু আমরা যখন কোনো আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে কিছু শুনি, তখন কিন্তু তা থেকে তথ্য গ্রহণ করা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না, বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সেই আদেশ-নিষেধ আমার মনকে কোনো না কোনো ভাবে উদ্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করতে পারছে কি না তা। যদি কোনো আদেশ বা নিষেধ আমার মনে কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে, তাহলে বলতে হবে যে, সেই আদেশ বা নিষেধটি আমি শুনতে পাইনি।

এ থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারছি যে, শুনতে হয় আত্মসমর্পণ দিয়ে, আনুগত্য দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, ভদ্রতা দিয়ে - শুধু কান দিয়ে নয়। এ জন্যে আল্লাহ বলেছেন যে, কাফেরদের অধিকাংশই শুনতে পায় না। এখানেও আমাদের একটি প্রশ্ন রয়ে যায়।

আল্লাহ কেন অধিকাংশের কথা বলেছেন? কেন সবার কথা বলেননি? আসলে সবার কথা বলা হয়নি এই কারণে যে, বাহ্যিক অর্থে তারা কান দিয়ে সবাই শোনে কিন্তু কিছু ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশই তা আত্মসমর্পণ এবং ভালোবাসা দিয়ে শুনতে পায় না। তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে যারা বিবেক, বুদ্ধি, অন্তরের সততা দিয়ে শুনতে পায় এবং ভবিষ্যতে তারাই সত্য পথের দিকে ধাবিত হয়।

শ্রবণশক্তির এই যে বৈশিষ্ট্য আমরা আবিষ্কার করলাম, এ এক মহা রহস্য। এই শক্তিকে আমরা যদি আমাদের জীবনের কাজে লাগাতে চাই, তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে যাত্রা শুরু করতে হবে, এবং আমাদেরকে আরো দূরের লক্ষ্যকে হাসিল করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রথমে আমাদেরকে আমাদের চোখ এবং কানের ময়লা পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হবে। এভাবে আমরা যখন আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে শাণিত করতে পারব তখন আমাদেরকে আমাদের অন্তঃকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তখন আমাদের অন্তঃকরণ এত স্বচ্ছতা এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে যে, তা চোখের সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে পারবে। শ্রবণ-শক্তির সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে পারবে। ফলে চোখ যা দেখে না তা তাও দেখবে। কান যা শোনে না তা তাও শুনবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সব নবীকেই মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলেছেন। এ বিষয়ে আমরা পবিত্র কোরআনে যতগুলো তথ্য পেয়েছি তার অধিকাংশই কিন্তু মূসা (আঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সতরাং আসুন আমরা আয়াতগুলিকে একটু বিবেচনা করি।

এই আয়াতগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, আল্লাহ চাচ্ছেন যে তাঁর কথা শোনা হোক। এবং তিনি কোথাও এমন ইঙ্গিত করছেন না যে, তাঁর কথা শোনার পর তা নিয়ে ভাবতে বসতে হবে, এবং বিচার-

বিশ্লেষণ করার পর সেই শ্রবণ-শক্তিকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। বরং তিনি বলছেন মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতে। শুনলেই যেন সব দায়িত্ব পালন হয়ে গেল।

আসলে বিষয়টি কিন্তু তাই। কারণ এর আগে আমরা দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জেনেছি যে, শোনার সঙ্গে অনেক কিছুই জড়িত, এবং অন্তরের পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে, সমগ্রতা দিয়ে আমাদেরকে শুনতে হয়। নইলে সেই শ্রবণ বড় জোর কান পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে, অন্তঃকরণে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্তঃকরণে পৌঁছালেও আমাদের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে তা কাজ করতে পারবে না। আনুগত্যের মধ্য দিয়ে তা কাজ করতে পারবে না ব'লে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে আমরা তা শুনতেই পাইনি। বধিরতা।

আল্লাহর বাণীকে শ্রবণ করার ক্ষেত্রেও তিনি চমৎকারভাবে বলেছেন যে, যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন যেন আমরা হৈহুল্লোড় না করি বরং আগ্রহভরে সেই দিকে মনোযোগ দেই এবং শুনি, যেন আমরা আল্লাহর রহমত পেতে পারি। এই শোনাও মূলত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা। আমরা কোনো কিছু শোনার সময়ে যে তথ্য গ্রহণ করি সেই তথ্য অনেক সময়ে আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হতে চায় না। কারণ হলো, আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, ধারাবাহিক চিন্তা, খণ্ডিত বিশ্বাস ইত্যাদি আমাদের অন্তঃকরণ এবং আমাদের শ্রবনেন্দ্রিয়ের মধ্যে দেয়াল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের চিন্তাকে, ধ্যান-ধারণাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে শুনি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কানে শোনা মানেই অন্তর দিয়ে শোনা। এই দুইয়ের মধ্যে কোনো ব্যাবধান থাকবে না। তাই আল্লাহ শুধু শুনতে বলেছেন। এবং শুধু শুনলেই একটি অন্তর মুহূর্তের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা হয়তো শুনতে পাই না। এ জন্যেই অন্তর থেকে কোনো সাড়া

উঠে আসে না। অথচ সত্য আমাদেরকে সর্বদাই ডাকছেন। ঘুমের মধ্যেও আমাদের উচিত কান খাড়া ক'রে রাখা, যেন সত্যের কোনো আহ্বানই আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রে অন্তরের মধ্যে জায়গা না পেয়ে আবার ফিরে না যায়।

আমরা যদি কোনো স্কীমা ছাড়াই শুনতে শিখি তাহলে সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা ক'রে চিনতে পারব। এই যোগ্যতাকে আল্লাহ বলেছেন ফোরকান জ্ঞান বা সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা ক'রে চিনতে পারার যোগ্যতা। একেই আমরা বলি বিবেক। অন্তরটাকে খালি ক'রে দিলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে যা অবস্থান করার কারণে তা পূর্ণ হতে পারতো, তার আগমন ঘটবে। সেরূপ শূন্য অন্তর নিয়ে আমরা যখন কোরআন পাঠ করব তখন কোরআন আমাদের সঙ্গে কথা বলবে। তখন কোরআনের রহস্যগুলি আমাদের অন্তরের সামনে ফুলের পাঁপড়ি মেলার মতো একে একে খুলে যাবে। এবং এভাবে আমরা অনন্তকাল ধ'রে সেই রহস্য জানতেই থাকব। নইলে শুধু কোরআন মুখস্ত করলে আমাদের দায়িত্বের কেবল এক অংশই পালন করা হলো, এবং দায়িত্বের মূল অংশই উপেক্ষিত হয়ে রইল।

সুতরাং আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে শাণিত করতে হবে। রবীঠাকুর চমৎকার ভাবে গান গেয়েছিলেনঃ আমি কান পেতে রই - (আয়াত হবে) আমার আপন হৃদয় গহনদ্বারে। তিনি বাইরের কিছু শোনার আগে ভিতর থেকেই শুনেছিলেন। আমরা যদি আমাদের অন্তরের গভীরে কান পেতে থাকি, দৃষ্টি মেলে রাখি, তাহলে প্রথম দিকে আমাদের অত্যন্ত বড় ধরনের লাভ হবে। আমরা আমাদের অন্তরের সংকীর্ণতাকে, অপূর্ণাঙ্গতাকে আবিষ্কার করতে পারব। এবং মানুষ তার যে সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে পারে, তাকে সে অতিক্রম করতে পারে। মানুষের জ্ঞানের এই মাহাত্যই মানুষকে মানুষ ক'রে তুলেছে।

এবং আমাদের অন্তরের এই সংকীর্ণতাকে যখন আমরা আবিষ্কার ক'রে ফেলবো তখন আমাদের অন্তঃকরণই আমাদের চোখ দিয়ে দেখবে, আমাদের কান দিয়ে শুনবে। এবং তখনো যদি আমরা আমাদের অন্ত রের মধ্যে কোনো কিছু দেখতে চাই বা শুনতে চাই, তবে সেই দেখা হবে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ।

পূর্ণাঙ্গতাকে না দেখা পর্যন্ত আমাদের বলা উচিত নয় যে, আমরা কোনো কিছু দেখেছি।

বরং আমাদের উচিত যিনি আমাদেরকে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ দান করেছেন, তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করা: প্রভু গো! আমাকে যখন এই শক্তিগুলি দানই করলে, তখন এই শক্তিগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার ক'রে আমাকে সত্য অনুসন্ধানের যোগ্যতাও দান কর। আমরা খুব বেশি না পারলেও দিনে অন্তত পাঁচবার তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। তোমার সঙ্গে দেখা করি। সুতরাং তুমি নিজেই নিজের করুণায় আমাদের সঙ্গে অন্তত দিনে একবার দেখা কর। এবং আমাদের অন্তরকে পাকড়াও কর। পরাধীন ক'রে দাও। তোমার দয়া এবং প্রেম দিয়ে।

কয়েকটি জিনিষ আমাদেরকে বাস্তবতার প্রকৃত রূপকে দেখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। সে গুলির অনেকগুলি সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। তবে এই প্রতিবন্ধকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হলো আনন্দের অনুভূতি। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করব 'আনন্দের আলোকচিত্র' নামক বইটিতে, ইনশাল্লাহ। তবে এখানে আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার খাতিরে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারাংশ তুলে ধরতে চাই, যেন আমাদের অন্তরের জন্য কিছুটা পথনির্দেশ পাওয়া যায়। আনন্দের রয়েছে বিভিন্ন

প্রকারভেদ। আমি যখন একটি ফুলকে নাকের কাছে ধ'রে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করি, তখন আমি আনন্দ পাই। এভাবে আমি যখন কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখি, যা সচরাচর দেখার সৌভাগ্য আমার হয় না, কিংবা আমি আগে দেখিনি, তাহলে তা দেখে আমি আনন্দ পাব। কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলি যখন আমরা লাভ করি তখন আমরা আনন্দ পাই। বিভিন্ন ধরনের আনন্দ রয়েছে এবং আক্ষরিক অর্থে মানব জীবনের আনন্দের মুহূর্ত অসংখ্য। তার কারণ হলো, আমরা যা কিছু করি, তার পেছনে লক্ষ্য হিসেবে কাজ ক'রে আনন্দ লাভ। যা ক'রে আমরা আনন্দ পাই না, আমরা তা সচরাচর করতে চাই না। আবার এমনটিও হয়ে থাকে যে, কোনো কাজ ক'রে আমরা আনন্দ পাই না, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে আমরা সেই কাজটি করতে বাধ্য হই, এবং তা করতে থাকি। কিন্তু এক পর্যায়ে সেই কাজের ফল আমাদেরকে আনন্দ দান করে, এবং তখন আমরা বুঝতে পারি যে, কষ্ট ক'রে হলেও আমরা কাজটি যে করতে পেরেছি, সেটি ছিল আমাদের জন্য সৌভাগ্য।

মোট কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য থাকে আনন্দ এবং সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই আমরা কাজ করি, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আনন্দকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি না ব'লে প্রতিনিয়ত নিরানন্দ ভোগ করি। কিন্তু কোনো কাজ কষ্ট ক'রে করতে হলেও ভবিষ্যতে এক পর্যায়ে আমরা আনন্দ লাভ করি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পরিশেষে আনন্দ ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। অন্তরের যে স্তর থেকে কাজের স্পৃহা উঠে আসে, সেই স্ত র আসলে একটি মাত্র স্তর নয়। বিভিন্ন ধরনের কাজ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের উৎস অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল। উদ্দেশ্যের উৎসের এই পার্থক্য সত্ত্বেও একটি উদ্দেশ্যের কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তা হলো আনন্দ লাভ। সবাই কেবলই

আনন্দ লাভ করতে চায়। আমাদের এই মানসিকতা আমাদের ধর্মবোধকেও আক্রান্ত ক'রে রেখেছে। অনেক ধর্ম ছিল, আছে, এবং থাকবে, যেখানে ধর্ম-কর্ম শুধু শিষ দেয়া নাচগান করা এবং আনন্দ লাভ করা। এ কথা আল্লাহ্ কোরআনে স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন। আসুন তাহলে আমরা আয়াতগুলি দেখি।

এভাবে আনন্দকে লক্ষ্য ক'রে আমরা যখন জীবনযাপন করতে শিখি, তখন আনন্দই হয়ে ওঠে আমাদের কর্মের প্রেরণা, এবং আমরা যেখানে আনন্দ লাভ করি না, সেখানে কোনো কাজ আমাদের দায়িত্ব হলেও তা আমরা করতে ব্যর্থ হই। সবচেয়ে সূক্ষ্ম আনন্দের যে তৃষ্ণাটি আমাদের অন্তত ঈমানের পথে স্থির হয়ে লেগে থাকার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে, তা হলো ইবাদতে আনন্দ। আমরা নামাজের মধ্যেও আনন্দ খুঁজি। আমরা বিভিন্ন বই থেকে জেনেছি যে, নামাজ কোনো চিন্তার জায়গা নয়। বরং তা হলো আত্মসমর্পণ এবং ভয়ের জায়গা, এবং একই সঙ্গে আশার জায়গা। তার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্কে ভয় করি এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করি। ভয় এবং আশা এই দুই-ই চিন্তামুক্ত অনুভূতি। অন্তরে যখন ভয় জেগে ওঠে, তখন সেই অন্তরে চিন্তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ফলে আমরা যে বিষয়কে ভয় পাই তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের একটি প্রত্যক্ষতা তৈরি হয়, মাঝে চিন্তার ব্যবধান থাকে না। অতএব নামাজ হলো আল্লাহ্র সঙ্গে আমাদের অন্তরের প্রত্যক্ষতার অনুষ্ঠান। অথচ সেখানেও আমরা লক্ষ্য হিসেবে আনন্দকেই বেছে নিয়ে ব'সে থাকি। যেহেতু আনন্দ আমাদের একটি কামনা, অর্থাৎ আমরা আনন্দকে পাবার জন্যে মনের মধ্যে কামনাকে জাগিয়ে তুলি, সেহেতু সেই কামনা একটি চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। যে কোনো কামনা-বাসনাও চিন্তার মতো অন্তরের ওপর প্রলেপ ফেলে দেয়, এবং অন্তর এবং সত্যের মাঝামাঝি দূরত্ব সৃষ্টি করে। এভাবে আনন্দ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের এবং সত্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যা কিছু

আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অবস্থান করে তা আসলেই মিথ্যা। কারণ, আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরেরই একটি সৃষ্টি। সেই মিথ্যাকে সন্ধান করতে করতেই আমাদের উপাসনা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আর আমরা আনন্দকে সন্ধান করি ব'লেই নামাজের মধ্যে আনন্দ পাই না। এবং আনন্দ পাই না ব'লে নামাজে আমাদের আগ্রহ ক'মে যায়।

মূলত নামাজ হলো ত্যাগের জায়গা। এবং নামাজের মধ্যে ত্যাগের সময়ে স্থান, কাল পাত্র তিন একাকার হয়ে মিশে আছে। সেখানে আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাগুলিকে, আমাদের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে ত্যাগ করি। যদি কেউ বলেন যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ধর্ম চর্চা হয় কিভাবে? তাহলে তার জবাবে আমরা শুধু এইটুকু বলব যে, তার জন্যে নামাজের বাইরে চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে অনেক সময় রয়েছে। নামাজ কোনো চিন্তার জায়গা নয়। বরং আমরা চিন্তা করব না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেও যখন নামাজে দাঁড়াই তখন স্বংক্রিয়ভাবে চিন্তাগুলি আমাদের মাথার মধ্যে এসে মৌমাছির মতো গুণ গুণ করতে থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় নামাজ কোনো চিন্তার জায়গা নয়। আমরা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চাই। কিন্তু আমার চিন্তা, কল্পনা, প্রবণতা, ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ইত্যাদি দিয়ে আমাদের অন্তরের চারপাশে আমরা যে বলয় সৃষ্টি করেছি, সেই বলয় এসে আমাদের এবং সত্যের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই বলয়ই হচ্ছে নামাজের মধ্যে আমাদের মাথায় যে চিন্তা উদিত হয় তা।

তাহলে প্রমাণিত হয়ে গেল যে নামাজ হচ্ছে দেবার জায়গা, নেবার নয়। যেহেতু আমি দেবার জন্যে নামাজে দাঁড়িয়েছি, সেহেতু আমাকে সঠিক জিনিষটিই দিতে হবে। আপনি-আমি আল্লাহকে অর্থ সম্পত্তি সন্ত ানাদি কিছুই দিতে পারি না। কারণ এগুলি আমাদের নয়, এগুলি সম্পূর্ণভাবেই তাঁর। আমরা যে এগুলি তাঁকে দিতেই পারি না, এই বোধ মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবার প্রথম কাজটি সম্পন্ন হয়ে

যায়। সব কিছুর মালিকানা যে তাঁর এ কথা স্বীকার করলে তাঁকে তো আর কিছু দেবার প্রয়োজন হয় না। তাহলে এইভাবে আমরা যখন আমাদের দেবার অপরাগতাকে আবিষ্কার করি, তখন বাকি থাকে একটি জিনিষ:

আমাদের মন।

আর মন বলে আলাদা কোথাও কিছু নেই। আমরা 'মনের কাঠামো' এবং 'আধ্যাত্মিক বুদ্ধির বিকাশ' বই দুটিতে মন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি, সেহেতু এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বরং আমরা এটুকু বলতে পারি যে, মনের রয়েছে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি বা বিভাগ প্রবণতা শক্তি অবস্থা ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে স্বচ্ছ যোগাযোগ ব্যাহত হয় ভ্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন ঋণাত্মক প্রবণতা ইত্যাদির দ্বারা।

নামাজের সময়ে আমরা আসলে এই মনটাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার জন্যেই দাঁড়াই। কিন্তু সেই সমর্পণ করার কাজে যদি আমরা চিন্তাকেই উস্কে দেই, তাহলে তার অর্থ এই হয়ে যায় যে, আমরা মনের দাবি ত্যাগ করতে পারছি না। মন যদি চিন্তাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে, এবং সেই সম্পদের প্রেমে প'ড়ে যায়, তাহলে সে নিজেকে সমর্পণ করবে কিভাবে? চিন্তা দিয়ে কখনও সত্যকে পাওয়া যায় না। চিন্তার ক্ষমতাই নেই সত্যকে ধারণ করার। তবে আমাদের সৌভাগ্য এই টুকু যে, আমাদের চিন্তা আমাদেরকে সত্যকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। যেই সেই চিহ্নিত করার কাজটি শেষ হয়ে গেল, অমনি আমাদেরকে সেই চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং প্রবণতাগুলিকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে। আর সমর্পণ করা মানে হলো নিজের কোনো সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেগুলিকে ব্যবহার না করার প্রতিজ্ঞা এবং অনুশীলন করা এবং সেই অনুশীলনে রত থাকা।

যা হোক, আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আমরা যদি আনন্দের সন্ধান করি, কিংবা ইবাদতে আনন্দ না পাওয়ার কারণে আমাদের ইবাদতের প্রতি একটি অনীহা সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা স্বার্থপরতার মতো আচরণ করেছি। আনন্দ লাভ করছি না ব'লেই আমরা ইবাদতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। ফলে সেই একই কথা দাঁড়াল। আমরা শুধু লাভই করতে চাই, ত্যাগ করতে চাই না। বরং আমরা যদি আনন্দের আকাঙ্ক্ষাকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে, বা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে, কিংবা সেই আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি ত্যাগ ক'রে, শুধুমাত্র আল্লাহর গোলামি করার উদ্দেশ্যে উপাসনায় রত হই, তাহলে সেই আনন্দ এমনিতেই আমাদের অন্তরকে আবৃত করবে। তখন সেই আনন্দ হবে আমাদের শ্রমের পুরস্কার, অর্জিত কোনো লক্ষ্য নয়। এই বিষয়টি নিয়ে হাজার পৃষ্ঠা ধ'রে আলোচনা ক'রেও তা শেষ করা সম্ভব নয়। সেহেতু বিষয়টিকে ভিন্ন একটি বইতে আলোচনা করার পরিকল্পনা রইল ইনশাল্লাহ। আপাতত শুধু এই কথাটিকে মনে রাখলেও চলবে যে, আনন্দের লোভ হলো অনেক ক্ষেত্রেই অন্তরের সবচেয়ে সংকীর্ণতম লোভ।

মা বাবা ভাই বোন এদেরকে প্রতিপালন করতে গিয়ে আমাদেরকে আপ্রাণ কষ্ট করতে হয়। সেই কষ্টে অনেকেই আনন্দ লাভ করে না ব'লে এক পর্যায়ে তাদেরকে ত্যাগ ক'রে দেয়। তখন তারা তাদের অর্জিত ধন-সম্পত্তিকে সেই কাজেই ব্যবহার করতে চায় যে কাজটিকে নিয়ে তারা তাদের দেহ-মনের জন্য আনন্দের ব্যাবসা করতে পারবে।

আনন্দের আকাঙ্ক্ষা নিছক দেহ-কেন্দ্রিক একটি আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারলে একটি ভিন্ন ধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। সেই আনন্দ দেহের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে যায়। এমনকি সেই আনন্দ এতই তীব্র হতে পারে যে, দেহ অনেক সময় যা ধারণ

করার যোগ্যতাই রাখে না। সেই আনন্দ অন্তরকে মুক্ত ক'রে দেয়। অন্তরের নোঙরগুলিকে খুলে দিয়ে অন্তরের নৌকাটিকে সত্যের মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। এই জাতীয় আনন্দের মুহূর্তেই সাধকগণ নেচে ওঠেন। তাদের এই নৃত্য এক মহাজাগতিক ঘটনা। হযরত রুমী (রহ.) এভাবে আল্লাহ প্রেমে বিভোর হয়ে নৃত্য করতেন। আমাদের প্রতিটি মানুষের অন্তরও সঠিক সময়ে নেচে ওঠে। সেই নৃত্য যখন আমাদের দেহকেও আচ্ছন্ন করে, তখন আমাদের দেহ-মন সবই নেচে ওঠে। এই নাচ দ্বারা আমরা কিন্তু সিনেমা ছায়াছবির নাচ বোঝাচ্ছি না। এই নাচ হলো দেহ মনের তন্ময়তা এবং মুক্তি। আপনি শুয়ে কিংবা ব'সে থাকা অবস্থায়ও আপনার অন্তরে এই নৃত্য অনুভব করতে পারেন। নৃত্য মানে মুক্তি (আয়াত হবে) পায়ের সাথে শিকলবিহীন চুক্তি। তাহলে আসুন আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে যত রকমের সংকীর্ণতা আছে সেগুলিকে দূর করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যখন সফল হয়ে যাব তখন অন্তরের নৃত্য উপলব্ধি করি, উপভোগ করি।

নিজের সন্তানকে দেখলে কার না অন্তর নেচে ওঠে? এবং বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, যে কোনো মানুষের সন্তানকে দেখলেই অন্তর ঠিক ওভাবে নেচে উঠতে পারে। পৃথিবীর যে কোনো দৃশ্য বস্তু প্রাণীকে দেখলেই আনন্দে অন্তর ওভাবে নেচে উঠতে পারে। সেই সুযোগ আমাদের প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ উপলব্ধি করার পূর্বশর্ত হলো আমাদের অন্তরকে শিকলমুক্ত করা। নৃত্য হলো শিকল-মুক্ত অন্তরের গতিবিধি। উন্মুক্ত প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীন আনন্দময় বিচরণ।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এবং প্রাণী একই প্রাণসত্তার বহিঃপ্রকাশ। ফলে আমার সন্তান যে শুধুই আমার রক্ত মাংসের ধারক তা নয়। গোটা

মহাবিশ্বের সবকিছুই আমার সত্ত্বার গভীরে এক হয়ে মিশে আছে। ফলে, সবকিছুর মধ্য দিয়েই কোনো-না-কোনোভাবে আমারই ভালোবাসা, ত্যাগ, স্নেহ-মমতার প্রকাশ ঘটে। গোটা মহাবিশ্বের সবকিছুই আমার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ফলে কোনো কিছুই আমার জন্যে নিরানন্দের নয়। এই বিষয়টিকে আমরা যদি আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে নিঃসন্দেহে আজ হোক আর কাল হোক, আমরা এক মুহূর্তের জন্যে হলেও বেঁচে থাকার প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারব। অর্থ সম্পত্তি সঞ্চয় করার মাধ্যমে বেঁচে থাকার আনন্দ পাওয়া যায় না। সেই আনন্দও এক ধরনের আনন্দ বটে, তবে সে আনন্দের সীমা রয়েছে। তা হলো প্রয়োজন পূরণের আনন্দ। প্রয়োজন মিটে গেলে তার আধিক্য আমাদেরকে আনন্দ দিতে পারে না। এ কারণে অতি-মাত্রায় ধনীরা অর্থ খরচ ক'রে আনন্দ তৈরি করার চেষ্টা করেন।

প্রকৃত আনন্দ হলো সেই আনন্দ, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, যদিও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেগুলি ক্রিয়ারত। প্রকৃত আনন্দ হলো মাটি থেকে উৎসারিত ঝর্ণার ফোয়ারার মতো, যা ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আমাদের অন্তর হলো প্রকৃত আনন্দের উৎস। সেখান থেকে তা উৎসারিত হয় এবং আমাদের দেহ-মনকে প্লাবিত ক'রে দেয়।

আমরা যখন ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হই, তখনও এক ধরনের আনন্দ পাই। অনিশ্চয়তার অনুপস্থিতি, সচ্ছলতার উপস্থিতি, দুঃখ-কষ্টের ক্ষেত্রে আর্থিক শক্তির প্রয়োগের সম্ভাবনা ইত্যাদি আমাদের অন্তরকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু এই আনন্দ মানে বেঁচে থাকার আনন্দ নয়। এ হলো কেবল জীবিত থাকার আনন্দ। এখনই তার প্রমাণ দিচ্ছি। বেঁচে থাকার আনন্দ হলো এই মুহূর্তের আনন্দ। কিন্তু বিপদ-আপদ থেকে

মুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের কিছুটা সময় পর্যন্ত একটি নিশ্চয়তা প্রাপ্তি মূলত জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষার আনন্দ, বেঁচে থাকার আনন্দ নয়; আমি আরো কিছু দিন ভালোভাবে জীবিত থাকতে পারব, এই আশ্বাসের আনন্দ, প্রকৃত বেঁচে থাকার আনন্দ নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে: তাহলে বেঁচে থাকার আনন্দ কী? যাবতীয় আনন্দই তো হয় অতীতের না হয় ভবিষ্যতের। এই বর্তমানের আনন্দ কোনটি? এর জবাব দিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ, এর জবাব আমাদেরকে আনন্দিত করবে না। বরং নিজেই এর জবাবে রূপান্তরিত হতে হবে।

অতীত এবং ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীলতাকে ত্যাগ করতে পারলে হয়তো বর্তমান আমাদেরকে বরণ ক'রে নেবে। আমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারি: অতীতের ওপর নিভরশীলতা বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি? বিষয়টা কিন্তু খুব বেশি কঠিন নয়। খুব কম লোকই আছেন যারা তাদের অতীত ঐতিহ্য মান সম্মান মর্যাদা ইত্যাদিকে এখনও ফলাও ক'রে ব'লে বেড়ান না। এভাবে তারা তাদের অতীতের সাহায্য নিয়ে তারা এখনও প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং সমাজে স্থান পাচ্ছেন। এর অর্থ কী দাঁড়াল? অর্থ দাঁড়াল এই যে, আমরা অতীত থেকে সহযোগিতা নিচ্ছি এবং অতীতের ওপর নির্ভর করছি। এভাবে আমরা যখন অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করি, তখন জীবনটাকে এই মুহূর্ত থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেই। অর্থাৎ এই মুহূর্তের শান্তিটুকু অনুভব করার যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলি। কারণ আমাদের কামনা আমাদেরকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। এই সবকিছু থেকে অন্তর যদি মুক্ত না হয়, তাহলে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া কখনওই সম্ভব নয়।

তবে জীবনের এই বিভিন্ন মাত্রাগুলির উপস্থিতিতেও ধর্মময় জীবন সম্ভব। আমরা এই মুহূর্তে সেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় ভাবছি কেবল সত্য

অনুসন্ধানের জন্য। কারণ যিনি যত ওপরে যেতে চাইবেন তাকে তত হালকা হতে হবে। অতীত এবং ভবিষ্যতের ভার আমাদের পিঠের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। অবশ্য এই ভারে ভারাক্রান্ত হয়েও সুন্দর জীবন যাপন করা সম্ভব। কিন্তু এই ভার থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সত্যকে জানার আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে আসুন আমরা সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন লক্ষ্যটিকেই নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করি। সেই লক্ষ্য যদি অর্জন করা না-ও সম্ভব হয়, তবুও আমাদের উন্নয়ন ঘটবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, মহান লক্ষ্য যখন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন চারপাশের জাগতিক বিষয়গুলি এমনভাবে সুসজ্জিত হয়ে যেতে থাকে যে, আজ হোক আর কাল হোক, সেই লক্ষ্য অর্জিত হবেই।

সমাপ্ত

আসুন, সবাই মিলে ইসলাম প্রচার করি

আজ আমার যে গবেষণাকর্মগুলির সাথে আপনি পরিচিত হয়েছেন, এগুলি দুই এক দিনের পরিশ্রমের ফল নয়। আমি আমার সামান্য রোজগার থেকে একটি বড় অংশ নিজেরই পিছনে বিনিয়োগ করেছি, যেন সামান্য হলেও মানবজাতির কাজে আসতে পারি। সময়, অর্থ ও শ্রমের সেই বিনিয়োগের ফলশ্রুতিই আজ আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে - বই ও সফ্‌ওয়ার আকারে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমি রোজগারের জন্য অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখালেখি করি। তা থেকে বর্তমানে যে রোজগার হয় তা থেকে ইসলামের জন্য ব্যয় করার জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না, কারণ ইংরেজি ভাষা সহ কয়েকটি বিষয় শেখানোর জন্য এমন কোনো অঞ্চল আর খালি নেই যেখানে আমি আমার সাধ্য মতো অবদান রাখিনি। নতুন করে লেখার মতো যা আছে তার পাঠক খুব সীমিত কারণ সেই লেখাগুলি খুব উঁচু পর্যায়ের চিন্তার সাথে জড়িত। তাছাড়া বর্তমানে লেখাপড়া হয়ে গেছে কোচিং-নির্ভর। প্রায় প্রতিটি কোচিং সেন্টার নিজস্ব বই-ই শিক্ষার্থীদের পড়ায়। তাদের অনেকেই পেশাগত ও শিক্ষাগত জীবনে আমার বই দ্বারা লাভবান হলেও কিছু শিক্ষক ছাড়া আর কেউ আমার বই শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য করেন না। ফলে ইসলামকে নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলাম তা নিজের রোজগারের ওপর নির্ভর করে শেষ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

পুরনো বইগুলির মধ্যে যেগুলি খুব ভালো চলে সেগুলির রয়্যালটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে - নইলে যেটুকু কাজ করেছি তাও করতে পারতাম না। ফলে রয়্যালটি হিসেবেও কিছু পাই না।

একটি কথা না বললেই নয়। আমি যেটুকু কাজ করার যোগ্যতা আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি, তার বড় জোর ২০% সম্পন্ন ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অর্থাৎ ৮০ ভাগই বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতা না পেলে তা করা সম্ভব হবে না। এখন এই পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছি যে ভবিষ্যতে ধর্ম নিয়ে যত সফ্‌টওয়ার তৈরি করব, সবই ইসলামের সেবায় এবং সারা পৃথিবীতে ধর্ম প্রচারের জন্যও (ওয়েব সাইটের মাধ্যমে) ফ্রি বিতরণ করব।

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি ইসলাম প্রচারের এই প্রোগ্রামে শরিক হতে চান তাহলে সাধ্য অনুযায়ী অবদান রাখুন। শুধু ইসলাম প্রচারই নয়, অনেক অভাবী লোকও আমার কাছে সাহায্য চায় এবং চিরকালই আমি আমার সাধ্য মতো অনেককেই কিছু না কিছু দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার ক্ষমতা এতই সীমিত যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। ভালো হতো যদি আমার পর্যাপ্ত আর্থিক যোগ্যতা থাকত।

ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমি আমার চারপাশে আর্তের আহাজারি দেখেছি - কিন্তু কারো জন্য তেমন কিছুই করতে পারিনি।

সামনে এমন কিছু বই ও ফ্রি সফ্‌টওয়ারের পরিকল্পনা রয়েছে যেগুলি গোটা মানবজাতিরই উপকার করবে বলে আমার বিশ্বাস। ভালো হতো যদি কাজগুলো বিনা বাধায় চালিয়ে যেতে পারতাম। শুধু একার পরিশ্রমে এত কিছু হয় না - কিছু লোককে সর্বদা কাজে খাটানো লাগে। তাদেরকে সন্তোষজনক বেতন-ভাতা দিতে হয়। সুতরাং আপনি চাইলে এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারেন।

তবে বিশেষ অনুরোধ, বিনীত অনুরোধ, কেউ সরাসরি আমার সাথে দেখা ক'রে দোয়া চাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন না। সেখানেও নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন। ওটা তাদেরই কাজ। আমার যোগ্যতায় যা ঢেলে দেয়া হয় তা আমি রচনাকর্মের মধ্যেই প্রকাশ ক'রে দেই। আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই।

আল্লাহ্ বলেছেন যে সঠিক নিয়তে ধর্মকে সাহায্য করার জন্য কেউ দান করলে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। তাকে **ইহকালে** ও **পরকালে** পুরস্কৃত করা হবে। সুতরাং কোনো মানত পূরণের আশায়ও কেউ অনুদান দিতে পারেন - আপনার নিয়ত-গুনেই আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করবেন, তার জন্য আমার দোয়ার প্রয়োজন হবে না। দোয়া তো সর্বদাই করছি ।

আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

(সূরা হজ, আয়াত : ৪০)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পা শক্ত করবেন।

(সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম।

(সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ১০৪)

যে-ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাক দেয়, সৎকাজ করে, আর বলে, 'আমি তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)', তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?

(সূরা হা-মিম-সিজদা, আয়াত: ৩৩)

মহাকালের শপথ! মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

(সূরা আসর, আয়াত: ১-৩)

তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করো। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন।

(সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ১২৫)

তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না।

(সূরা জুমার, আয়াত: ৫৩-৫৪)

যারা সত্য এনেছে ও যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো সাবধানি। তারা যা চাইবে এমন সবকিছুই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। এ-ই সৎকর্মপরায়ণের পুরস্কার। কারণ, তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা ক'রে দেবেন ও সৎকাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

(সূরা জুমার, আয়াত: ৩৩-৩৫)

আল্লাহর সেই অবশ্যম্ভাবী নির্ধারিত দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয় থাকবে না, আর তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না।

(সূরা শুরা, আয়াত: ৪৭)

আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওদেরকে যে-বিষয়ে সাবধান হতে হবে তা ওদের কাছে পরিষ্কার ক'রে বলা হয়। আল্লাহ তো সব বিষয়ই ভালো করেই জানেন।

(সূরা তওবা, আয়াত: ১৫)

অনেকেই ভুলবশত মনে ক'রে থাকেন যে আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন কিংবা কোরআন বোঝার তৌফিক দান করেছেন কিংবা যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন তাদের এমন কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা দ্বারা তারা অন্যদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম। কিংবা তাদের সান্নিধ্য পেলে কেউ বিপদ-আপদ ও দারিদ্র্য থেকে

মুক্ত হয়ে যাবে। এই ধারনা একেবারেই ভ্রান্ত। উদ্ধার করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। বলা যেতে পারে যে, আমরা একে অপরের জন্য দোয়া করতে পারি এবং তাতেই দোয়া করার যোগ্যতা ও অন্তরের পবিত্রতা অনুযায়ী কাজ হবে। কিন্তু কারো সান্নিধ্য কারো জন্য আল্লাহকে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে সাহায্য করবে না। বরং কেউ যদি কিছু কামনা করে, তাহলে সেই কামনা চরিতার্থ করার জন্য তার উচিত আল্লাহর কাছে দোয়া করা, তওবা করা এবং দান-সদকা করা। অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। স্বয়ং রসূল (স.)ই বলেছেন যে তাঁর নিজের হাতে ভবিষ্যৎ জ্ঞান ছিল না, অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না, জগতের সম্পদের ভাণ্ডার ছিল না, নিজের ভালো-মন্দের ওপরও নিজের কোনো হাত ছিল না। আসুন তাহলে আয়াত দেখা যাক:

লোকে তোমাকে সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে।' তুমি এ কী করে জানবে! হয়তো সময় শীঘ্রই এসে যেতে পারে।

(সূরা আহজাব, আয়াত: ৬৩)

যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তুমি বলো, 'আমি তোমাদের সকলের কাছে এমনিভাবে ঘোষণা করছি, যদিও আমি জানি না, তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসন্ন না দূরে। তিনি তো জানেন তোমরা মুখে যা বল ও যা লুকিয়ে রাখ। আমি জানি না, হয়তো এ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা, তার জীবনের উপভোগ তো কিছুকালের জন্য।'

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৯-১১১)

ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন ঘটবে?' তোমার কী বলার আছে এ-ব্যাপারে? এর চূড়ান্ত (সিদ্ধান্ত) তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। তুমি তো একজন সতর্ককারী-তার জন্য যে একে ভয় করে।

(সূরা নাজিআত, আয়াত: ৪২-৪৫)

বলো,' এ এক মহাসংবাদ, যার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। উর্ধ্বলোকের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে এই প্রত্যাদেশ এসেছে যে আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

(সূরা সা'দ, আয়াত: ৬৭-৭০)

এই হতচ্ছাড়া যে কিনা পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না, তার চেয়ে কি আমি ভালো না? (সে নবী হলে) কেন তাকে সোনার বালা দেওয়া হল না, কেনইবা ফেরেশতারা তার সঙ্গে আসে না?

(সূরা জুখরুফ, আয়াত: ৫২-৫৩)

বলো, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেই শরিক না করে।

(সূরা কাহাফ্, আয়াত: ১১০)

বলো, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি আর তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরিক করি না।' বলো, 'আমি তোমাদের ভালোমন্দের মালিক নই।' বলো, 'আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, আর তাঁকে ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়ও নেই। কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়ে আর তাঁর আদেশ প্রচার ক'রেই আমি রক্ষা পাব।' যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

(সূরা জিন, আয়াত: ২০-২৩)

বলো, 'আমি জানি না যে-বিষয়ে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির ক'রে রেখেছেন।'

(সূরা জিন, আয়াত: ২৫)

Send your donation to:

BRAC BANK
Account No. 1503100267807001 (Savings Account)
Account Name: S. M. Zakir Hussain
Bangladesh

Email: smzhussains@gmail.com. এই ইমেইল অ্যাড্রেসে নিজের নাম-পরিচয় পাঠিয়ে দিন - পরবর্তী সফ্‌টওয়ারে সাহায্যদাতা হিসেবে আপনার নাম উল্লেখ করা হবে। এবং ইনশাল্লাহ শীঘ্রই আমরা Qu'ran

Research Institute নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করব, যেখানে গভীর ধর্মচর্চার দর্শন আলোচিত হবে।

লেখকের অন্যান্য বই:

১. সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!

২. কোরআনের মোনাজাত এবং হাম্‌দ

৩. বক্তৃতার ব্যাকরণ

৪. কোরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস এবং অলৌকিকের সান্নিধ্য লাভ

৫. আল্লাহর পরিচয়

৬. কোরআন এবং জেনেটিকস্‌

৭. কোরআনিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল ও মৃত্যুহীন জীবন

৮. প্রশান্ত আত্মায় মৃত্যুহীন পরম শান্তি

৯. গোপন মৃত্যু ও নবজীবন (১ম ও ২য় খণ্ড)

১০. ধ্যানের শক্তি এবং নবজীবন

১১. তাওহীদের গূঢ় রহস্য

১২. সৌন্দর্যতত্ত্ব

১৩. কলেমা তাইয়্যেবা ও সাহাদার মারেফত

১৪. আফসোসের শক্তি এবং তার সদ্ব্যবহার

THE MOON BEHIND THE CLOUD:
INFALLIBLE WAYS OF SEEING THE TR

By S.M. Zakir Hussain

A Publication of
GYANKOSH PROKASHONI